দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

কংগ্রেসী জমানায় উপেক্ষিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র
—পৃ: ১১

প্যারিসের জলবায়ু চুক্তি ও ভারত
—পৃ: ১৫

৬৮ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা।। ১৮ জানুয়ারি ২০১৬।। ৩ মাঘ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ণ পরমাণু যুদ্ধের থেকেও ভয়ঙ্কর

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ৩ মাঘ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১৮ জানুয়ারি - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

খোলা চিঠি : 'বং-বাং' জোট হচ্ছে, হচ্ছেই...
□ সুন্দর মৌলিক □ ৯

নেতাজী সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ফাইল নষ্ট করে ফেলা হয় নেহরুর নির্দেশে □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

কংগ্রেসী জমানায় উপেক্ষিত নেতাজী □ দেবব্রত ঘোষ □ ১১

নেতাজীর অর্থনৈতিক চিন্তা : নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ
□ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ১৩

প্যারিসের জলবায়ু চুক্তি ও ভারত □ মোহিত রায় □ ১৫

সঠিক স্থানে অর্থ সঞ্চয় করুন □ লক্ষ্মী দাস □ ২০

কাশ্মীরের পবিত্র তীর্থ 'হরমুখ গঙ্গা' □ রিনি রায় □ ২১

হিন্দু ধর্মই সনাতন ধর্ম □ সৌমেন নিয়োগী □ ২২

সংস্কার ও সাধনা □ রঙ্গাহরি □ ২৭

বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও পরিবেশ দূষণ □ ড. অভিজিৎ মুখার্জি □ ২৯

আসন্ন বসন্তে অসমে ফুটতে পারে পদ্ম □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □

সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৭ □ **অন্যরকম : ৩৮**

□ **খেলা : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১** □

প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

আগামী সংখ্যা প্রজাতন্ত্র সংখ্যা। প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি আমাদের সংবিধান। সেই প্রজা বা গণতন্ত্রের ভাবনা আমাদের রাষ্ট্রজীবনে কতটা প্রতিফলিত? আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা কি সেই গণতন্ত্র বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে? নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কি বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে খাটো করতে চাইছেন? রক্ষকরাই কি ভক্ষকের ভূমিকায়— এই আশংকা তৈরি হচ্ছে? ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি? এই নিয়েই আলোচনা করেছেন অম্লানকুসুম ঘোষ, সমীর পাল, তারক সাহা প্রমুখ।

দাম একই থাকছে ১০্ টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কালিয়াচক : শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা

শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু শাক দিয়া মাছ ঢাকা দেওয়া যাইলে বাজারে শাকের দামই বেশি হইত, মাছের নয়। শাক দিয়া যেমন মাছ ঢাকা চলিতে পারে না তেমনি মিথ্যার কৌশলে সত্যকে চাপা দেওয়া যাইতে পারে না। কালিয়াচকে কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যাহা বলিতেছেন তাহা মিথ্যার বেসাতি মাত্র। আসলে মুসলমান ভোটের লালসায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে মিনি বাংলাদেশে রূপান্তরিত করিতে চাহিতেছেন। আর এই সুযোগে জঙ্গি মুসলমানরা রাজ্যে ঘাঁটি মজবুত করিতে সচেষ্ট। এখন দেখা যাইতেছে পূর্বের নানা জঙ্গি সন্ত্রাসের ঘটনার মতোই পাঠানকোট হামলার সঙ্গেও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জঙ্গিগোষ্ঠীও যুক্ত রহিয়াছে। এই রাজ্যে জাল পাসপোর্ট তৈরির কারখানা চালু হইয়াছে, রাজ্যের নানা স্থানে বিশাল অস্ত্রভাণ্ডারের খোঁজ মিলিতেছে, হইতেছে জাল টাকার আমদানি। নারী পাচারে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের জেলাগুলি বিস্ফোরক অবস্থায় রহিয়াছে। প্রশ্ন হইল, বি এস এফের সঙ্গে বিবাদ থাকিলে থানা আক্রমণ কেন? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই সব ঘটনা চাপা দেবার জন্য সবরকম চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মুসলমানদের তোষণ করিয়া ক্ষমতায় আরোহণ। কিন্তু ইহার পরিণতি কী হইতে পারে তাহা কল্পনা করিবার বোধবুদ্ধি তাঁহার নাই। মুখ্যমন্ত্রী কালিয়াচক লইয়া নানা কৌশল করিতেছেন। কখনও বলিতেছেন সীমান্তরক্ষীবাহিনীর সহিত গ্রামবাসীদের বিবাদ লইয়া এই গণ্ডগোল হইয়াছে, আবার কখনও বলিতেছেন দুষ্কৃতীরা হামলা করিয়াছে। কিন্তু সেইদিন যাহারা থানায় ঢুকিয়া সরকারের সম্পত্তি ধ্বংস করিল, বাছিয়া বাছিয়া হিন্দুর দোকানপাট সম্পত্তি লুঠ করিল, তাহাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রহিয়াছেন। অথচ এখনই যদি ইহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না লওয়া হয় তাহা হইলে আগামী দিনে বড় ধরনের বিপদ আসিবে।

বিপদ যে সম্মুখে উপস্থিত তাহা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বোধগম্য হইলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তাহা লইয়া হেলদোল নাই। বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের যে প্রক্রিয়া চালু করিয়াছে মুসলমান আতঙ্কবাদীরা ক্ষমতার লালসায় তাহাকেই সফল করিতে উদ্যোগ লইতেছেন তিনি। মুর্শিদাবাদ ইতিমধ্যেই জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল হইয়াছে। সেই জেলায় হিন্দুরা শাঁখ বাজাইতে পারিবে না, স্কুলে সরস্বতীপূজা করিতে পারিবে না। নিত্য নতুন তালিবানি ফতোয়ায় হিন্দুরা মুর্শিদাবাদ ছাড়িতেছেন। জঙ্গিদের পরবর্তী লক্ষ্য মালদা জেলা। কালিয়াচকের ঘটনা তাহারই প্রতিচ্ছবি। কালিয়াচকের ঘটনায় থানার পুলিশ অফিসার কনস্টেবলদের বদলি করিয়া, বিজেপির সংসদীয় প্রতিনিধি দলকে আতঙ্কিত স্থানে যাইতে না দিয়া সত্য ঢাকিতেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামীদিনের ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য তাহাকেই দায়ী থাকিতে হইবে। মুখ্যমন্ত্রী যতই জঙ্গিদের তোষণ করুন পশ্চিমবঙ্গের কোনো অংশই ভবিষ্যতে বাংলাদেশ হইবে না। নিজেদের বোধবুদ্ধিহীনতায় বাঙালি পূর্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিতাড়িত হইবার অবস্থা হইলে মানুষ তৃণমূলকে ছাড়িবে না। বাংলাদেশি জঙ্গিদের মদতকারী মমতাকে বিতাড়িত করিতে মানুষের বেশি সময় লাগিবে না।

সুভাষিতম্

উপকারিষু যঃ সাধুঃ সাধুত্বে তস্য কো গুণঃ।
অপকারিষু যঃ সাধুঃ স সাধুরিতি কীর্তিতঃ।।

যদি কেউ উপকারীর উপকার করে তবে তার মহত্ত্ব কোথায়? সাধু তিনিই যিনি অপকারির উপকার করে থাকেন।

নির্বাচনের আগে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র লোপাট করাই ছিল কি কালিয়াচকে হামলার লক্ষ্য ?

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা ॥ এন আই এ-র একটি দল জাল নোটের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের খোঁজে কালিয়াচকে রয়েছে। তারা এই অপরাধের যুক্ত কয়েকজনকে শনাক্ত করে। তাছাড়া পোস্ত চাষ, ড্রাগ, চোরাকারবার ও বেআইনি অস্ত্র তৈরির সঙ্গে যুক্ত এমন অনেক অপরাধীদের খোঁজেও এন আই এ এখানে সক্রিয়। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক জেলার জেলা শাসককে অপরাধীদের একটি তালিকা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এক লক্ষের উপর উগ্র মুসলমান জনতার মধ্যে কি বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী ঢুকে নির্বাচনের আগে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রগুলি লোপাট করল? কারণ কিছুদিন আগেই এন আই এ সূত্রে জানা গেছে, জেহাদিরা পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলাকে কব্জা করার পরিকল্পনা করেছে।

জেলাগুলি হলো— মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনা। পাশাপাশি বাংলাদেশের চারটি জেলা— রাজশাহী, কুষ্টিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও সাতক্ষিরা এবং নিম্ন অসমের একাংশও তাদের লক্ষ্যের তালিকায় ছিল।

কালিয়াচকে বর্তমান শাসক দলের নেতাদের সঙ্গে থানার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ। তাদের প্রচ্ছন্ন মদতেই চলছিল অপরাধ জগতের রমরমা ব্যবসা। জালনোট, পোস্ত চাষের কোটি কোটি টাকার কারবার। এন আই এ কিছু অপরাধীকে শনাক্তও করেছিল। এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সুযোগে প্রথমত সেইসব অপরাধীদের গুরুত্বপূর্ণ নথি লোপাট করা হলো। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট আই এস আই-এর জঙ্গি কিছু লোক কালিয়াচক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সূত্রের খবর, ঘটনার দিন ভুল করে পাকিস্তানের একটি ম্যাসেজ কালিয়াচকের এক হিন্দু দোকানদারের মোবাইলে ঢুকে যায়। ম্যাসেজটিতে জেহাদি কার্যকলাপ চালানোর নির্দেশ লেখা ছিল। সেই ম্যাসেজটি থানাতে জমা পড়েছে। তৃতীয়ত, কালিয়াচককে হিন্দুশূন্য করে ইসলামি শাসন কায়েম করার গভীর চক্রান্ত করেছিল জেহাদি মুসলমান মৌলবাদীরা। পূর্বপরিকল্পনা মাফিকই এইসব চক্রান্ত করা হয়েছিল। মালদার প্রবীণ মানুষদের বক্তব্য, দেশভাগের আগে মালদা- মুর্শিদাবাদ জেলায় এভাবেই হিন্দুদের আতঙ্কিত করা হয়েছিল।

বিশেষ সূত্রে খবর, ঘটনার দিন কালিয়াচকের শ্মশন, দুইশত বিঘা, মহব্বতপুর প্রভৃতি সীমান্ত দিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক বাংলাদেশ মুজাহিদ্দিনের জঙ্গি মালদায় ঢুকে পড়ে।

গত মঙ্গলবার ৫ জানুয়ারি পুলিশ কালিয়াচক থানার হামলার সঙ্গে যুক্ত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে পাশের মোথাবাড়ী থানাতে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে মালদা জেলা আদালতে। সেইদিন অন্য অপরাধীদের কালিয়াচক ঘরিয়ালিচকে গ্রেপ্তার করতে গেলে গ্রামবাসী মুসলমানরা বোমা পিস্তল নিয়ে পুলিশের উপর চড়াও হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও রবারবুলেট ছোঁড়ে। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় কালিয়াচক দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এদিনের ঘটনায় পুলিশের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। পুলিশের একাংশ চাইছে সিবিআই তদন্ত হোক এবং যারা পুলিশ ও হিন্দুদের উপর হামলা চালিয়েছে তাদের শনাক্ত করে শাস্তি দেওয়া হোক। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশের উপরতলার নিষ্ক্রিয়তা এবং সরকারের মুসলমান তোষণই এই ঘটনার জন্য দায়ী।

গত ৬ জানুয়ারি বিজেপি-র পক্ষ থেকে মালদা শহরে এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তি এবং এস পি-র পদত্যাগ-সহ একাধিক দাবিতে মিছিল করা হয়। বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য-সহ রাজ্য নেতারা কালিয়াচকে যেতে চাইলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে। প্রশ্ন হলো, কালিয়াচকে এত বড় মুসলমান সমাবেশ হবে অথচ গোয়েন্দা দপ্তর কিছুই জানতে পারলো না কেন? মাত্র ১৫ জন পুলিশকে এত বড় ভিড়ের জন্য কেন থানায় রাখা হলো?

বাংলাদেশে হিন্দুদের সম্পত্তি দখলে শাসকদলের নেতা, মন্ত্রী ও সাংসদরা যুক্ত

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদসহ নয়টি সামাজিক সংগঠন নিয়ে গঠিত 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেল' দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্পত্তি দখলের বেশির ভাগ ঘটনায় শাসক আওয়ামি লিগের মন্ত্রী, সাংসদ ও নেতৃবৃন্দের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ করা হয়। ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গিতে সংখ্যালঘুদের জায়গাজমি দখল ও তাদের ওপর হামলা নিয়ে এক তথ্যানুসন্ধানে প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে জতীয় নাগরিক সমন্বয় সেল এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করলেও নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সারাদেশের সংখ্যালঘুদের সামগ্রিক চিত্র উঠে আসে। সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামি লিগের মন্ত্রী ও সাংসদদের কাছে নিজেদের অবস্থা তুলে ধরেন।

লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ও বিগত তদারকি সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত বছরের ২৪ ও ২৫ নভেম্বর জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেলের প্রতিনিধিরা সুলতানা কামালের নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি ও পাড়িয়া ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, তিন দিকে ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় আওয়ামি লিগ সংবাদ দবিরুল ইসলাম যে চা-বাগান গড়ে তুলেছেন তার মধ্যে ১০টি হিন্দু পরিবারের ৩৫ একর চা-বাগান ও আবাদি জমি রয়েছে। এর মধ্যে অকুল চন্দ্র সিংয়ের এক বিঘা জমি অন্য জমিতে যাওয়ার পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কড়িডোরের মতো এই এক বিঘা জমি দখল হয়ে গেলে সংখ্যালঘু ১০টি পরিবারের লোকজন তাদের নিজ জমিতে যাওয়ার

কোনো পথ পাবেন না। এই ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন, সাংসদের ছেলে মাজহারুল ইসলাম সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে তাদের জমি সাংসদের কাছে বিক্রি করার জন্যে চাপ দিয়ে আসছেন। সাংসদের বাধার কারণে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের প্রয়াত নেতা হেলকেতু সিংয়ের ছেলে বুধুরাম সিং তার ২৭ শতাংশ জমিতে দীর্ঘদিন ধরে চাষাবাদ করতে যেতে পারছেন না। নাগর নদীর তীরে যাওয়ার রাস্তার খাসজমি দখল করে চাবাগানে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছেন সাংসদ। অকুল চন্দ্র সিংহের জমির চা-গাছের চারা সাংসদের লোকজন নষ্ট করে দিয়েছে। জমি বিক্রির জন্যে চাপ দিতে সাংসদের ছেলে মাজহারুল ইসলামের নেতৃত্বে কয়েক মাস আগে অকুল চন্দ্র সিং, ভাকারাম সিং ও জনক চন্দ্র সিং-সহ কয়েকজনের ওপর হামলা চালানো হয়। হামলা থেকে বাঁচতে অকুল চন্দ্র সীমন্তের ওপারে আশ্রয় নেন। হামলায় অন্তত ১০ জন আহত হয়। লাঞ্ছিত হন নারীরাও। পুলিশ ও প্রশাসন জেনেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। মামলা হয়নি সাংসদের ভয়ে, কেউ গ্রেপ্তারও হননি। তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়, 'শুধু ঠাকুরগাঁ নয়, সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখলের একের পর এক ঘটনা এবং তাতে প্রশাসনের ভূমিকা দেখে আমরা হতবাক হচ্ছি।' পরিদর্শন প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট তবারক হোসেন, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন, অর্পিত সম্পত্তি প্রতিরোধ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে বালিয়াডাঙ্গির ভুক্তভোগী আকুল চন্দ্র সিং, ভাকারাম সিং, জিতেন্দ্র চন্দ্র সিং ও বিশ্বজিৎ রায় উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে সুলতানা কামাল বলেন, ঠাকুরগাঁওয়ের ঘটনায় সাংসদ দবিরুল ইসলাম সরাসরি জড়িত। বিগত কয়েক মাসে ঝালকাঠি, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, মুন্সিগঞ্জসহ কয়েকটি জেলায় সংখ্যালঘুদের জায়গাজমি, বাড়িঘর দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় সরকারের সাংসদ-মন্ত্রীরা জড়িত।

সম্মেলনে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথ বলেন, পিরোজপুরের সাংসদ এ কে এম এ আউয়ালও সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছেন। দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ৫৫টি ক্ষত্রিয় পরিবারের ওপর দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার নির্যাতন চলছে। এর সঙ্গে জড়িত গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। এর আগে ফরিদপুরের মন্ত্রী খন্দকার মোশারফ হোসেন এক হিন্দু জমিদারবাড়ি দখল করেন বলে অভিযোগ ওঠে। সংবাদ সম্মেলনে গভীর ক্ষোভে বলা হয়, যাদের রক্ষকের দায়িত্বে থাকার কথা, তারাই ভক্ষক হয়ে উঠেছেন।

উবাচ

"বিশ্বকে ভারত আধ্যাত্মিকতা দিয়েছে, সাম্প্রদায়িকতা নয়।"

—প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী
দিল্লীতে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে 'অসহিষ্ণুতা' প্রসঙ্গে।

"অনাবাসী ভারতীয়দের আধার কার্ড দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা-ভাবনা করছে।"

—কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ
প্রবাসী ভারতীয় দিবস উপলক্ষে ৯ জানুয়ারি নয়াদিল্লীতে।

"কেজরিওয়াল সরকারের মর্জিতে নিযুক্ত ১৪০ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং নিয়োগের ভিত্তি কী?"

—সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি টি এস ঠাকুর

"চীন বিশ্বের যে কোনো দেশে তার মাল বেচতে চায়। আচমকা ইউয়ানের অবমূল্যায়নে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

—নির্মলা সীতারামন, শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী।

"মনীশ তেওয়ারী কংগ্রেসের স্বীকৃত মুখপাত্র নন। তিনি নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রী-গোষ্ঠীরও কেউ নন। তিনি অসত্য কথা বলেছেন।"

অভিষেক মনু সিঙভী
কংগ্রেস নেতা।
২০১২ সালে সেনা অভ্যুত্থানের মিথ্যা গুজবকে চাগিয়ে তুলতে তেওয়ারীর সাম্প্রতিক বক্তব্যের জবাবে।

সন্ত্রাস দমনে পাকিস্তানের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাঠানকোট হামলায় পাক-যোগাযোগ প্রমাণিত হবার পরেই আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তান। একদিকে আমেরিকা ক্রমাগত পাকিস্তানের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, অন্যদিকে মার্কিন সেনেটর রন জনসন রীতিমতো বোমা ফাটিয়েছেন যে সৌদি আরব পাকিস্তানের কাছ থেকে পরমাণু অস্ত্র কিনতে পারে। আর এই জোড়া সাঁড়াশি চাপে পাক-মন্ত্রী স্বীকার করে নিয়েছেন যে শতাধিক পাকিস্তানি আই এস আই এস-এ যোগদান করতে গিয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর আশ্বাস এসব আটকাতে সরকার যথাসাধ্য ব্যবস্থা নেবে। সি এন এন-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেনেটর রন জনসন সম্প্রতি মন্তব্য করেন : 'সৌদি আরবের সঙ্গে এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজে লাগাতে রিয়াধ পকিস্তানের কাছ থেকে পারমাণবিক অস্ত্র কিনতেই পারে। এবং সেটা করলে মধ্য-পূর্ব এশিয়া পুনরায় অশান্ত হবে।' তাঁর এই সতর্কবার্তার মধ্যেই আমেরিকা সর্বোচ্চ পাক প্রশাসনকে পরামর্শ দিল তাদের দেশ থেকে সমস্ত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য। মার্কিন সরকারের মুখপাত্র জন কিরবি-র বক্তব্য, পাক-প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে যে তাদের দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদীদের তাড়াতে তারা বদ্ধপরিকর।

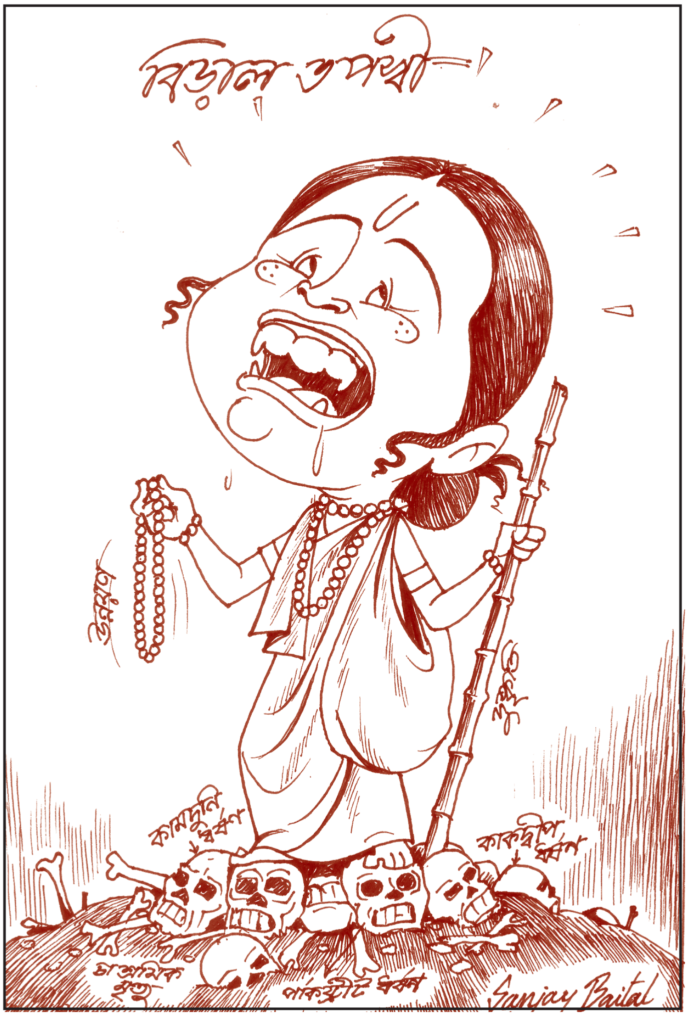

‘বং-বাং’ জোট হচ্ছে, হচ্ছেই....

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

আর সময় নেই। বিধানসভা নির্বাচন সমাগত। এখন জোট বাঁধুন। ঠিক করে ফেলুন কী করবেন। আগের বিধানসভা নির্বাচনের কথা ভাববেন না। তখনকার মিত্রপক্ষই এবার শত্রুপক্ষ। সুতরাং নতুন ভোট, নতুন জোট।

গতবার ছিল পরিবর্তনের ডাক। তার বিরুদ্ধে মূল ও তৃণমূল দুই কংগ্রেসের জোট। ভোট শেষ হতেই জোট শেষ হয়। বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দিল্লীতে অথবা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচিতি পাকা সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে।

এবার নতুন দিন। তৃণমূল কংগ্রেসের এবার কোনো জোট নেই। গতবার কংগ্রেস ছাড়াও সারদার সঙ্গে গোপন জোট ছিল। রোজভ্যালির সঙ্গেও জোট ছিল। আরও আরও চিটফান্ডের সঙ্গে জোট ছিল। তারা আসন বণ্টনে ছিল না কিন্তু অর্থ বণ্টনে ছিল। এবার তাই তৃণমূল কংগ্রেস মূলত জোট করছে টালিগঞ্জের শিল্পীদের সঙ্গে।

আর এবার তো শুধু ক্ষমতায় আসার লড়াই নয়। রাজ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হওয়ার লড়াইও আছে। এখনও পর্যন্ত যা অবস্থা ক্ষমতায় টিকে থাকার ওষুধ তৃণমূল নেতাদের পকেটে পকেটে। নির্বাচন কমিশন যতই বজ্র আঁটুনি দিক তার ফস্কা গেরো বের করার জন্য তৈরি দিদির ভাই বাহিনী। ব্লু-প্রিন্ট তৈরি। কোথায় অনুব্রত, কোথায় পরমাণুব্রত সব ঠিক হয়ে আছে। লিখে দিচ্ছি, জয় নিশ্চিত। তবে জনতা জনার্দন যদি জোট করে ফেলে তবে কী হবে জানি না।

এদিকে আবার নতুন জোট হচ্ছে। হচ্ছেই। প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা যতই বায়না করুন মা সোনিয়া তাতে কান দেবেন না। বিহারের মতো এখানেও জোট মেনে নেবেন রাহুল। জোট গড়ে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে হয়তো গরমে একটা শীতের দেশে সফরে চলে যাবেন।

সিপিএমও তথৈবচ। এতকাল ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির একজোট হওয়ার আহ্বান ছিল। এখন সেই ছাতার তলায় কংগ্রেসও অচ্ছুত নয়। সরাসরি জোট-সম্ভাবনায় নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য কংগ্রেস হাইকমান্ডকে বার্তাও দিয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। তাঁর সাফ কথা, আর সময় নেই।

বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে বামেদের জোট বা সমঝোতা হবে, সরাসরি এমন কথা এখনও সিপিএম নেতৃত্ব বলেননি। দলের ভিতরে-বাইরে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার দাবি যদিও প্রবল। সূর্যবাবুও সরাসরি বলেননি, তাঁরা জোটের পথেই হাঁটবেন। কিন্তু যে কথা তিনি বলেছেন, তাতে বার্তা স্পষ্ট। যার পরে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বও বলছে, তাঁরাও হাইকমান্ডের সঙ্কেতের অপেক্ষায়।

সিটুর হাওড়া জেলা সম্মেলন উপলক্ষে সমাবেশ থেকে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক কৌশলে বল ঠেলে দিয়েছেন কংগ্রেসের কোর্টেই। সূর্যবাবু বলেছেন, তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে বৃহত্তর লড়াই চান তাঁরা। তার জন্য যিনি যে ঝান্ডার লোকই হন, বামেদের সঙ্গে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে যোগ দিন। এদিন তিনি বলেন, “অনেকে আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, কংগ্রেসের সঙ্গে কি জোট হবে? প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে বলেছি, দু’টি স্লোগান আছে— তৃণমূল হঠাও, রাজ্য বাঁচাও আর বিজেপি হঠাও, দেশ বাঁচাও! কংগ্রেসের অসুবিধা বুঝি। ওদের হাইকমান্ড আছে। আমাদের আহ্বান আপনারা শুনেছেন। আপনাদেরও স্লোগান যদি এক হয়, তা হলে হ্যাঁ বলে দিন! যদি না মেলে, তাও বলে দিন!”

বিরোধী দলনেতা এও বলেছেন যে, ‘কংগ্রেস বলছে সময় লাগবে। কিন্তু বেশি সময় তো নেই!’ এদিকে কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরীও জোটের জন্য অধীর অপেক্ষায়। সুতরাং হাইকমান্ডের কাছে তিনিও সেই আবেদন পেশ করে চলেছেন। হিসেব বলছে বাম-কং জোট এখন সময়ের অপেক্ষা।

নতুন এই জোটের নাম দেওয়া যেতে পারে— ‘বং-বাং’। মানে বঙ্গের বাম-কং।

বিজেপিকে রুখতেই হবে। এটাই কি বং-বাং জোটের লক্ষ্য? নাকি তৃণমূলকে হঠানো?

লক্ষ্য যাই হোক। দিদিমণি চিন্তায়। ওনার চিন্তা মুসলমান ভোট নিয়ে। তাঁর ওই বড় মূলধনে এই নয়া জোট যদি ভাগ বসায় তবেই তো হয়ে গেল! তবে দিদিমণির চিন্তার কোনো কারণ তো আমি দেখি না। এ রাজ্যে হিন্দুভোট কি আদৌ একাকাট্টা হবে! তাহলে তো রাজ্যের রংটাই গেরুয়া হয়ে যাবে এই নির্বাচনে।

— **সুন্দর মৌলিক**

নেতাজী সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ফাইল নষ্ট করে ফেলা হয় নেহরুর নির্দেশে

গূঢ় পুরুষের কলম

মহানিষ্ক্রমণ। ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারির রাতে কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে কাবুল রওনা হওয়ার ঘটনা সুভাষচন্দ্র বসুকে নেতাজী নামে অমর করেছে। সে রাতে গাড়ি চালিয়ে নেতাজীকে গোমো স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর ভাইপো ২০ বছরের ডাক্তারির ছাত্র শিশির কুমার বসু। হ্যাঁ, এই মহানিষ্ক্রমণের পর্ব থেকেই সুভাষচন্দ্রের নেতাজীতে উত্তীর্ণ হওয়া শুরু। চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণের ৭৫ বছর পূর্তি হচ্ছে। ঘটনাটিকে অন্তর্ধান না বলে মহানিষ্ক্রমণ বলছি। কারণ সে ছিল তাঁর স্বদেশ ছেড়ে শেষ যাত্রা। তিনি আর ঘরে ফেরেননি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন ভারতের দোরগোড়ায়। বৃটিশ মিত্রশক্তি ইউরোপ ও এশিয়ার রণাঙ্গণে ক্রমাগত পিছু হঠছে। সুভাষচন্দ্র গৃহবন্দি। অসুস্থ। এমন এক পরিস্থিতিতে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন দেশত্যাগ করে সশস্ত্র সংগ্রামের। রক্তের অঞ্জলি দিয়ে ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচন করার। সময়টা ছিল ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাস। সেই বছরের অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি সুভাষচন্দ্র বৃটিশ পুলিশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জেলের মধ্যেই দুর্গাপুজোর আয়োজন করলেন। দেবীর কাছে সংকল্প করলেন আত্মাহুতিদানের। মা'র কাছে প্রার্থনা করলেন সাহস ও শক্তির। হয় দেশের স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু।

ডাঃ শিশির কুমার বসু ১৯৭৫ সালে তাঁর লেখা স্মৃতিচারণে মহানিষ্ক্রমণের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র বসুকে ডাঃ বসু এবং পরিবারের ছোটরা রাঙাকাকাবাবু বলতেন। শিশিরবাবুর কথায়, 'অল্প কদিন পরেই আমাদের গোমো যাত্রা ঠিক কী ধরনের হতে চলেছে সে সম্বন্ধে রাঙাকাকাবাবু আমাকে আর একটু খুলে বললেন। প্রথমত, উনি ছদ্মবেশ গ্রহণ করবেন। দ্বিতীয়ত, সীমান্ত প্রদেশ থেকে তিনি সংকেতের প্রতীক্ষা করছেন। সঙ্কেত পেলে যাবার দিন স্থির হবে। উনি যে দেশত্যাগ করতে চলেছেন সে কথা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বের হবার নানারকম প্ল্যান প্রস্তাবিত হলো। শেষ পর্যন্ত একটা ফাইনাল প্ল্যান দাঁড় করানো গেল। ১৯৪০-এর বড়দিনে আমাকে একটা সহ্যশক্তির পরীক্ষা দিতে হলো। রাঙাকাকাবাবু বললেন, সকলে উঠে গাড়ি চালিয়ে বর্ধমান চলে যাও। ওখানে রেলস্টেশনে দুপুরের খাওয়া খেয়েই আবার সোজা গাড়ি চালিয়ে কলকাতা ফিরে এসে কতটা ক্লান্ত হয়েছি তা রিপোর্ট করতে হবে। চলে গেলাম। ফিরে এসে রিপোর্ট করলাম, অবস্থা মোটামুটি ভালই।'

'এলগিন রোডের বাড়ি থেকে কীভাবে নিষ্ক্রান্ত হবেন সব স্থির হয়ে গেল। তিনি পশ্চিমী মুসলমান ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ পরে থাকবেন। একদিন রাত্রে তিনি পোশাক পরে ঘরের বিরাট আয়নায় নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে দেখে নিলেন। এরপর তিনি সকলের চোখে ধুলো দেবার যে পরিকল্পনা করেছেন সেকথা প্রকাশ করলেন। রাঙকাকাবাবু ঘোষণা করবেন যে তিনি কিছুদিনের জন্য লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাচ্ছেন। এই স্বেচ্ছাকৃত অবসর ব্রত যাপনের সময় তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না। কথাও বলবেন না। যে ঠাকুর তাঁর মা'র রান্না করে, তার উপর ভার থাকবে খাবারটা সময়মতো পর্দার তলা দিয়ে ঠেলে দেওয়ার। আহার্য হবে নিরামিষ তরকারি, দুধ, ছানা, মিষ্টি আর ফল। তিনি চলে যাওয়ার পরও এই ভাঁওতাটা চালিয়ে যেতে হবে। গোপনে খাবারগুলো ইলাকে (ভাইঝি) খেয়ে নিতে হবে।'

অবশেষে এলো সেই দিনটি। ১৬ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার, ১৯৪১-এর রাত। সুভাষচন্দ্র বসু নিষ্ক্রান্ত হলেন তাঁর প্রিয় স্বদেশ ভূমি ছেড়ে। চিরকালের মতো। থেকে গেলেন ভারতবাসীর হৃদয়ে। সামরিক পোশাকে সজ্জিত নেতাজীকে স্মরণ করতে গেলে ১৬ জানুয়ারি দিনটা ভুললে চলবে না। নেতাজীকে দেশবাসী স্মরণ করে ২৩ জানুয়ারি। তাঁর জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়ে। ১৬ জানুয়ারি আমরা প্রণত হবো নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণের দিনটিতে। ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের সংকল্পে তাঁর মহানযাত্রা ভুলছি না, ভুলব না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভারত সরকার নেতাজী সংক্রান্ত সমস্ত গোপন ফাইল তথ্য জানার অধিকার আইনে প্রকাশিত করা শুরু করবে ২৩ জানুয়ারি থেকে। অনেকেই ভাবছেন গোপন ফাইল প্রকাশিত হলে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তা' মনে করি না। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ফাইল ১৯৫৩-৫৪ সালে নেহরুর নির্দেশে নষ্ট করে দেওয়া হয়। নেহরু ছিলেন কট্টর নেতাজী-বিরোধী। নেতাজীর নেতৃত্বে আই এন এ যখন ভারতের মাটিতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন নেহরু হুঙ্কার দিচ্ছেন তিনি খোলা তরবারি নিয়ে নেতাজীকে আটকাবেন। একাধিক সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে রাখা নেতাজী সংক্রান্ত সমস্ত গোপনীয় ফাইল নেহরুর নির্দেশে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে রাখা ফাইলগুলির কিছুটা রাখা আছে। সেগুলিই ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে। নির্বিষ সেইসব ফাইল থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়ার আশা খুবই ক্ষীণ। ■

কংগ্রেসী জমানায় উপেক্ষিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র

দেবব্রত ঘোষ

স্বাধীন ভারতবর্ষে নেতাজী তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি ও সম্মান পাননি, নেহরু জমানাতেও না, ইন্দিরা জমানাতেও না। ১৯৪৫ সালের ২৯ আগস্ট নেহরু লিখছেন, 'সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি যুদ্ধাপরাধীর মতো ব্যবহার করা উচিত। কারণ তিনি ও তাঁর সেনাবাহিনী অসংখ্য মার্কিন ও ইংরেজকে হত্যা করেছে এবং বার্মা ও মালয়ে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র বসু বলপূর্বক বহু অর্থ আদায় করেছেন।' নেহরু কী করে ভুলে গেলেন তার প্রিয় ইংরেজরা জালিয়ানওয়ালাবাগে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল, ইঙ্গ-মার্কিন-ইংরেজ সেনাবাহিনী ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে অসংখ্য মানুষকে মেরেছে। তারা যদি নেহরুর দৃষ্টিতে অপরাধী না হয় তাহলে কোন্ যুক্তিতে সুভাষচন্দ্র বসু অপরাধী।

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ দিল্লী থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও সারাদিন বারবার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে অনুষ্ঠান প্রচার করেছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম ধরে ধরে সম্মান জানানো হয়েছিল রেডিওতে কিন্তু একবারের জন্যও নেতাজীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এই ছিল স্বাধীন দেশে তৎকালীন নেহরুপন্থীদের আচরণ। সেই শুরুর দিন থেকেই চলেছে নেতাজীর প্রতি কংগ্রেসীদের উপেক্ষা। ১৯৫৩ সালে আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাস কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর একটা অডিও ভিস্যুয়াল তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেছিল যেখানে বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছিল, কিন্তু নেতাজীর নাম একবারের জন্যও উল্লেখিত হয়নি বা তার কোনো ছবিও প্রদর্শনীতে রাখা হয়নি। শুধু একটা কথা লেখা ছিল, "He is that particular man who could not do what Gandhiji was able to do." ১৯৮০ সালে ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের Audio Visual Publicity Director পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর একটা প্রদর্শনী করেছিলেন যেখানে গান্ধীজীর ৬টি ছবি, জওহরলাল নেহরুর ১৬টি ছবি, ইন্দিরা গান্ধীর ২৫টি ছবি টাঙানো ছিল কিন্তু নেতাজীর একটাও ছবি ছিল না।

আজাদ হিন্দ বাহিনী বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করার আগে নেতাজী আন্দামান ও নিকোবরের দ্বীপপুঞ্জের নতুন নামকরণ করেছিলেন স্বরাজ দ্বীপ ও শহীদ দ্বীপ, যেটা স্বাধীন দেশের নেহরু সরকার বদলে দেয়। যে গোবিন্দবল্লভ পন্থ ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী অধিবেশনের সময় নেতাজীর সবচাইতে বেশি বিরোধিতা করেছিলেন সেই গোবিন্দবল্লভ পন্থের নামে নামাঙ্কিত হয়ে গেল আন্দামান সেলুলার জেলের একাংশ। যখন নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই চালাচ্ছে তখন এই নেহেরু তাঁর 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' বইতে লিখছেন, "We told Indian public that inspite of their indignation against British Policy, they must not interfere in any way with the operations of British or Allied Armed forces as this would be giving indirect aid to the enemy aggressor." নেহরুর কাছে সুভাষচন্দ্র বহিরাগত আগ্রাসী আর বৃটিশরা তাঁর প্রাণের বন্ধু। এই নেহরু ১৯৪০ সালের ২০ মে তারিখে বলছেন, "since the second world war is now going on and British Government is engaged in life & death struggle, we, the Indians should not start any movement against the British. Inspite of all that has happend we are not going to embarrass the British war efforts in india."।

ভারতে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র বারবার কংগ্রেস নেতাদের কাছে, বিশেষ করে গান্ধীজীর কাছে আবেদন করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিনাশর্তে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে (১৯৩১ ও ১৯৩৩ সালে, কংগ্রেস অধিবেশন : ১৯২৮ সালে কলকাতায়, ১৯২৯ সালে লাহোরে, ১৯৩৮ সালে ত্রিপুরীতে, ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরীতে)। কিন্তু আপোশকামী বিপ্লবভীরু কংগ্রেস নেতারা তাতে কান দেননি, কারণ তাদের লক্ষ্য ছিল আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে যতটা ক্ষমতা পাওয়া যায় সেটুকু ভোগ করে তৃপ্ত থাকা। শেষ অবধি যখন গান্ধীজী রাজি হলেন ১৯৪২ সালে, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তার 'India Wins Freedom' বইতে লিখছেন, "I saw that escape of Subhas Chandra Bose to Ger-

many made a great impression on Gandhiji and now I found a change in his outlook.”।

স্বাধীন ভারতে আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর কোনো সৈনিককে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়নি। কারণ নেহরুর দৃষ্টিতে যেহেতু আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর সৈনিকরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, অতএব তাঁরা রাজদ্রোহী। আজাদ হিন্দ সৈনিকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তারা যেন নিজেদের দেশে গিয়ে চাষবাস করে জীবন ধারণ করে। কোনো স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী কী এই ধরনের ভ্রান্ত পদক্ষেপ নিতে পারেন? নেহরু পেরেছিলেন। কারণটা অনুমেয়— তার ব্যক্তিগত নেতাজী বিরোধিতা।

নেহরু যেখানে লিখছেন, “Launching a civil disobedience camaign at a time when Britain is engaged in life death war against the axis power, would be an act derogatory to India's honour.” তখন ইংরেজ ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডস নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লিখছেন, “Bose himself welcomed the possibility of conflict because a blow to Britain in Europe would undoubtedly weaken her grasp on India. Other Congress Leraders had no such clear cut vision of the future” (Last year of British India). ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ কোনো মানুষের দৃষ্টিকে কী পরিমাণে অন্ধ করে দিতে পারে নেতাজী বিরোধিতার ক্ষেত্রে নেহরু তার অনবদ্য উদাহরণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওয়ার ক্রিমিনালদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে নেতাজীর নাম ছিল। ওই ওয়ার ক্রিমিনালদের বিচারের সময়সীমা আনলিমিটেড করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৮ সালের ২৬ নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটা সার্কুলার জারি করেছিল (২৩৯১/৩) কিন্তু ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স তাতে সই করেনি as if they are not imperialists. কিন্তু ভারত সরকার তাতে সই করেছিল এবং নেতাজীর নাম তাতে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী চুক্তিতে সই করে মেনে নিয়েছিলেন নেতাজী যুদ্ধাপরাধী এবং তাকে দেশে দেখা গেলে বিচারের জন্য UNO-তে handover করা হবে। এটাই আমাদের দেশের জাতীয় কংগ্রেস নামধারী নেতাদের চরিত্র এবং এরাই কয়েক দশক ধরে ভারতে পারিবারিক শাসন চালিয়ে এসেছে।

> **“স্বাধীন ভারতে আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর কোনো সৈনিককে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়নি। কারণ নেহরুর দৃষ্টিতে যেহেতু আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর সৈনিকরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, অতএব তাঁরা রাজদ্রোহী।”**

জওহরলাল ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে সিঙ্গাপুর ভ্রমণের সময়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের মৃত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের কর্মসূচি মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে বাতিল করেন। এমনকী তাঁর নেতৃত্বে যখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলো তখন কেন্দ্রীয় আইনসভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে সর্বদলীয় প্রস্তাব আনা হলেও মাউন্টব্যাটেনের পদত্যাগের হুমকিতে ভয় পেয়ে তা প্রত্যাহারের ব্যবস্থাও করেন। পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়ার মহম্মদ আনোয়ার হুসেন, যিনি প্রথম জীবনে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ছিলেন, একটি চিঠিতে খোলাখুলি অভিযোগ করেছিলেন যে, ১৯৪৯ সালে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত আজাদ হিন্দ র‍্যালিতে প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে তিনি ও আরো কয়েকজন প্রাক্তন আজাদি সৈনিক নেহরুকে অনুরোধ করেছিলেন লালকেল্লার প্রধান প্রবেশদ্বারের সম্মুখে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে, কিন্তু নেহরু এই আবেদন উপেক্ষা করেন। সিঙ্গাপুরে সমুদ্রতটে আজাদ হিন্দ শহীদদের জন্য যে স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছিল যেটি পরে মাউন্টব্যাটেনের আদেশে ধূলিসাৎ করা হয় নেহরুর উপস্থিতিতে।

আমাদের দেশের আপোশকামী মেরুদণ্ডহীন কংগ্রেস নেতারা স্বাধীনতার জন্য নিজেদের রক্তদানে রাজি ছিলেন না, তাই নেতাজীর ত্যাগের মূল্য ও মর্ম তাঁদের কাছে নেই। আমাদের দেশে নেহরু-ইন্দিরার নামে অসংখ্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, খেলার মাঠ, কাপ-মেডেল-টুর্নামেন্ট, পুরস্কার, নানা প্রতিষ্ঠান, বিমানবন্দর রয়েছে— যেন এই বিশেষ পরিবারটি ছাড়া ভারতের জন্য আর কেউ লড়াই করেননি। তাদের দৃষ্টিতে নেতাজী তো নন-ই। তাই আজও তিনি অবহেলিত।

নেতাজীর অর্থনৈতিক চিন্তা : নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ

অম্লানকুসুম ঘোষ

ইতিহাসের এক চরম দুর্ভাগ্য হলো ইতিহাস সৃষ্টিকারী কোনো মহামানবের জীবন আলোয় ইতিহাসের যখন আমরা পর্যালোচনা করি তখন বেশিরভাগ সময়েই সেই শক্তির বিশ্লেষণ হয় তাঁর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে। পক্ষপাতহীন ভাবে তাঁর বিচার বিশ্লেষণ করা হয়ে ওঠে না প্রায়ই। আবার যে সামান্য কয়েকবার পক্ষপাতহীনভাবে তার বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তখন সেই ব্যক্তির জীবনের যে অধ্যায় বা দিকটি সর্বাপেক্ষা আলোকোজ্জ্বল সেই দিকটিই হয়ে ওঠে প্রধান বিচার্য, অন্য দিকগুলি থেকে যায় বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে যাচাই ও প্রকাশের বাইরে। অথচ সেই দিকগুলির মধ্যেও থাকতে পারে অনেক যুগান্তকারী ঘটনার সঙ্কেত বা চিন্তার কোনো মহান আভাস। জীবনীতে অনুল্লেখিত বা স্বল্পলিখিত সেইসব ঘটনা পরম্পরা থেকে বঞ্চিত হয় ইতিহাসের একাগ্র পাঠক। তাই ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণকারীর উচিত যে কোনো মহান ব্যক্তির জীবনের আপাত-উপেক্ষিত দিকগুলিকেও বিশ্লেষণ করা।

এমনই এক মহান ব্যক্তি হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ভারতের স্বাধীনতাযজ্ঞের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক এই মানুষটিকে নিয়ে গবেষণা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু সেই গবেষণাকার্যের অধিকাংশই তাঁর অন্তর্ধান বিষয়ে, কিছু আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তাঁর ভূমিকা নিয়ে। অর্থাৎ তাঁর সুভাষচন্দ্র থেকে নেতাজী হয়ে ওঠার পরের পর্যায় নিয়েই যাবতীয় গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড। কিন্তু তিনি নেতাজী হয়ে ওঠার আগেই, অর্থাৎ ভারতে অবস্থানকালেই বহু যুগান্তকারী কর্মকাণ্ডের নায়ক ছিলেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে থেকে আপাতত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই বিশ্লেষিত হলো এই নিবন্ধে।

আই সি এস ত্যাগী সুভাষচন্দ্র যখন গান্ধীজী ও দেশবন্ধুর আহ্বানে জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তখন আরো অনেক আন্দোলনকারীর মতো সুভাষচন্দ্র শুধুমাত্র আবেগে ভর করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েননি এবং এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে এ কথা বিশ্বাস করেননি। সেকথা তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাতের পরেই তিনি ব্যক্ত করেছেন। ১৯২১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি এবং ২ মার্চ যে দুটি চিঠি তিনি কেমব্রিজ থেকে লিখেছিলেন দেশবন্ধুকে তার দুটিতেই কংগ্রেসের 'Indian currency and Exchange' সম্পর্কে কোনো স্থায়ী নীতি না থাকার কথা উল্লিখিত হয়েছিল। এবং সেই সমস্যার সমাধানকল্পে কংগ্রেসের স্থায়ী আড্ডা অর্থাৎ অফিস স্থাপন এবং স্থায়ী গবেষণাকর্মী নিয়োগ করে গবেষণাকর্মের বিকাশ সাধন করে currency and Exchange-র ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন এবং দেশের অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ২ মার্চের চিঠিতে অধিকন্তু একথাও বলেছেন যে, এখন স্বরাজ অর্জনের সময় অর্থাৎ বিদেশির পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার সময়, এখন গঠনের কথা অর্থাৎ অর্থনীতির নতুন জগতের দ্বারোদ্ঘাটনের কথা ভাবার অর্থ ভাঙনের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ স্বরাজ লাভের পর সেই স্বরাজকে সঠিক পথে প্রবাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও চিন্তা আগে থেকেই অর্জন করা।

১৯২৩ সালে 'জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন'-এ সভাপতির ভাষণে তিনি শিল্পশিক্ষার প্রাসঙ্গিকতার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেই শিল্প ছিল ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, যেমন আখ চাষের এলাকায় চিনি তৈরির কল। রেশম চাষের এলাকায় রেশম তৈরির কল ইত্যাদি কোনোরূপ বৃহৎ শিল্পের কথা তিনি তখন বলেননি। বরং বৃহৎশিল্পের বিরোধিতা করেছেন। কারণ, বৃহৎশিল্পে মানুষ চাকরিরত থাকে অর্থাৎ সেই অধীনতা, তার চেয়ে ক্ষুদ্র বা কুটিরশিল্পে মানুষ মালিকানা স্বত্ব নিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে।

কিন্তু অর্থনীতি কোনো স্থাণু শাস্ত্র নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বঅর্থনীতির এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিরও

পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৩ বড় দীর্ঘ সময় পথ পরিবর্তন। ইতিমধ্যে কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে সুভাষচন্দ্র ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত অতিবাহিত করেছেন, ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত মান্দালয়ের জেলে, ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত রাজ্য রাজনীতিতে ঘোরতরভাবে জড়িত, ১৯২৭-এ Bangal volunteers-এর General Commanding Officer, ১৯২৮-২৯-এ যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তীব্র বিরোধ ও অবশেষে লবণ সত্যাগ্রহে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পুনরায় কারাবরণ। এতসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাকে ব্যাহত করেছিল নিঃসন্দেহে। এরপর কারামুক্ত সুভাষচন্দ্র ইউরোপে যান। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে পুনরায় অর্থনীতি সংক্রান্ত চিন্তায় তিনি কিয়দংশে ব্রতী হন। এসব তাঁর তৎকালীন রচনা ও বক্তৃতাসমূহ থেকে জানতে পারা যায়। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি হওয়ার পূর্বপর্যন্ত তিনি মেঘনাদ সাহার সঙ্গে বহুবার পত্রবিনিময় করে ভারতীয় অর্থনীতির মূল সমস্যা ও সমাধানের ব্যাপারে মত বিনিময় করেন। ইতিমধ্যে তিনি ইউরোপ ভ্রমণকালে রাশিয়া ভ্রমণ করে বৃহৎ শিল্পের ব্যাপারে অবহিত হন এবং বৃহৎ শিল্পের পক্ষপাতী হন। ড. সাহার সঙ্গে পত্রবিনিময়ে তার বহু উল্লেখ পাওয়া যেত। সুভাষচন্দ্রের অর্থনীতি চিন্তা তখন উৎপাদনমুখী ও বৃহৎ শিল্প-নির্ভর। রাশিয়ার মতো বৃহৎ শিল্প প্রবর্তন, সেই শিল্পসমূহের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং পার্টির একানায়কতন্ত্র তিনি অন্তত কিছুকাল চেয়েছিলেন। গান্ধীজী বলেছিলেন, স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস ভেঙে দেওয়া উচিত, কারণ স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস তার অস্তিত্ব বজায় রাখলে কায়েমি স্বার্থের সুবিধা লাভের সম্ভাবনা। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল স্বাধীনতার পর কংগ্রেস উঠে গেলে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কে করবে, তাই কংগ্রেসের স্বাধীনতার পরও থাকা জরুরি এবং স্বাধীনতার পর বেশ কিছুকাল দেশে কংগ্রেসের শাসন থাকা উচিত (১৯৩৮ হরিপুরা কংগ্রেস সভাপতির ভাষণ)। অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই মতেরও পরিবর্তন হয়েছিল। ১৯৪০ সালে রামগড়ে আপোশবিরোধী সম্মেলনে (তখন তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত) তিনি বলেছিলেন যে দেশের নেতৃত্ব স্বাধীনতার আগে ও পরে শুধুমাত্র কংগ্রেসের কিছু প্রধান ব্যক্তিই করবেন তা নয়, বরং নানা দলের ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকেও অনেক তরুণ নেতৃত্ব উঠে এসে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে। রাজনৈতিক বক্তব্য বদলালেও তাঁর মূল অর্থনৈতিক দর্শনের পরিবর্তন তখনও হয়নি। বৃহৎ শিল্প ও তার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ অর্থনীতির এই দর্শনে তিনি শেষদিন অবধি আস্থাশীল ছিলেন। ১৯৩৮-এ কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীনই প্ল্যানিং কমিশনের প্রবর্তন করেন। কংগ্রেস সভাপতিই পদাধিকারবলে প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতি হবেন বলে ঠিক ছিল, কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়াকে কমিটির সভাপতি হতে অনুরোধ জানান বোম্বাই প্রদেশে ও প্রাদেশিক মহীশূর রাজ্যে তাঁর শিল্পায়ণকাজে বিপুল সাফল্যের জন্য। কিন্তু পরে ড. মেঘনাদ সাহার অনুরোধে তিনি জহরলালকে প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতি নির্বাচন করেন। কারণ ড. সাহার মতে কংগ্রেসের প্রথম সারির একজন নেতা এই কমিশনের চেয়ারম্যান না হলে এই প্ল্যানিং কমিশনের প্রস্তাব প্রস্তাবাকারেই থেকে যাবে। যদিও প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতি হয়ে জহরলাল গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানালেও সভাপতি নেতাজীকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন। (সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং, শঙ্করীপ্রসাদ বসু পৃ. ৮৪)। ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন বৃহৎ শিল্প স্থাপন ছাড়াও বৃহৎ শিল্প সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতো। হরিবিষ্ণু কামাথ প্ল্যানিং কমিশনের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন।

কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্রের বিতাড়নের পর সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের ১ ডিসেম্বর মূলত বাংলার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য 'ন্যাশনাল ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' গঠন করেন। এই বোর্ড শুধুমাত্র বৃহৎ শিল্প স্থাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষি-সংস্কার (যন্ত্রচালিত কৃষি ব্যবস্থা চালু, সেচ সংস্কার) ও বিপনন ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের উপরেও জোর দেয়। এছাড়া নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা গঠন করা তাঁর লক্ষ্যের মধ্যে ছিল। যে সংস্থার কাজ হোত কৃষক, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্পকে ঋণদান করা এবং তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখা।

'ন্যাশনাল ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন' অবশ্য গত বছর পর্যন্ত টিকে ছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস-চ্যুতির পর প্ল্যানিং কমিশনও জহরলালের কব্জায় চলে যায়। জহরলাল-চালিত প্ল্যানিং কমিশন নেতাজীর আদর্শচ্যুত হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকরণের সহায়ক হয়।

নেতাজী কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক নীতিসমূহের সঙ্গে গান্ধীজীর মতবিরোধ ছিল। উভয়ের বক্তব্যেই যুক্তির সারবত্তা ছিল। সে যুক্তি অধিকাংশ সময়েই পরস্পরবিরোধী হলেও তাঁদের লক্ষ্য ছিল দেশের উন্নয়ন— কখনোই ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা নয়। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনীতি এঁদের কারো নির্দেশানুসারেই চলেনি। তাই কালের কষ্টিপাথরে কার নীতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হোত সে প্রশ্নের উত্তরও অজানা থেকে গেছে। তার বদলে জহরলালের দ্বারা প্রবর্তিত মিশ্র অর্থনীতির জগাখিচুড়ি স্বার্থান্বেষী নীতিতে চালিত হয়েছিল দেশ। পরিণাম আজ সর্বজনবিদিত। বিগত শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকে নেওয়া নেতাজীর অর্থনৈতিক নীতি আজ হয়তো প্রাসঙ্গিক হবে না। তবে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে অত সুদূরপ্রসারী চিন্তা করা নেতাজীর দূরদৃষ্টিরই পরিচায়ক। ■

প্যারিসের জলবায়ু চুক্তি ও ভারত

মোহিত রায়

গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে— এমন আশঙ্কা শুরু হয় গত শতাব্দীর আশির দশকে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের কিছু পর থেকেই অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির। বিষয়টিকে তাঁরা গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন যাকে এক কথায় বলা হয় বিশ্ব উষ্ণায়ণ বা Global Warming। এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নিতে ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত হলো ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ— আইপিসিসি (Intergovernmental Panel on Climate Change–IPCC)। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে বসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন। বিশ্ব উষ্ণায়ণ নিয়ে দুশ্চিন্তা এই সম্মেলনে প্রথম আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পেল, তৈরি হলো একটি দলিল— United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)। এটি একধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি যার ফলে উষ্ণায়ণকারী গ্যাসগুলির নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এই চুক্তিতে পৃথিবীর দেশগুলিকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করা হলো। প্রথম দলে (এনেক্স ১) রইলো উন্নত দেশগুলি অর্থাৎ ইউরোপের দেশগুলি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া। আর অন্য দলে উন্নয়নশীল দেশগুলি যার মধ্যে রয়েছে ভারত ও চীন। পশ্চিমের ধনী ও গরিব দেশগুলিকে আলাদা করবার কারণ হলো যে পশ্চিমের দেশগুলির শিল্পোন্নয়নের কারণে শিল্পপ্লিবের সময় থেকেই (ধরা হয় ১৮৫০ সাল থেকেই) তারা অনেক বেশি বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বাতাসে ছাড়ছে। সুতরাং আজকের বায়ুমণ্ডলে যে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস জমে বিপদ ঘটাচ্ছে সেজন্য হিসাব করতে হবে সেই দেড়শো' বছর আগে থেকেই। একে বলা হচ্ছে ঐতিহাসিক দায় যা ভুললে চলবে না। এছাড়া নব্বইয়ের দশকে প্রধান কার্বন নির্গমনের উৎস ছিল আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলি। এই চুক্তিতে বলা হলো যে প্রথম দলের দেশ তাদের উষ্ণায়ণকারী গ্যাসগুলির নির্গমন ১৯৯০ সালে যতটা হোত তার থেকেও কমিয়ে আনার চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে উন্নয়নশীল বা গরিব দেশগুলির কোনো দায়িত্ব থাকবে না।

১৯৯৪ সালে ৫০টি দেশ এই চুক্তিতে সম্মতি দেওয়ায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিয়ম অনুযায়ী চুক্তিটি কার্যকর হলো। ঠিক হলো প্রতি বছর স্বাক্ষরকারী দেশগুলি একবার করে মিলিত হবে, একে বলা হয় Conferences of the Parties (COP)। ১৯৯৫ সালে প্রথম সিওপি বসে বার্লিন শহরে। এভাবে গত একুশ বছর ধরে প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে সিওপি বসেছে। ২০১৫-র সম্মেলন হলো প্যারিসে যেটি একুশতম সিওপি সম্মেলন। এই সিওপি সভাগুলি কার্বন নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করতে এই চুক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলীর প্রস্তাব এনেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়মকানুন চালু হয় ১৯৯৭-এ জাপানের কিয়োটো-তে বসা তৃতীয় সিওপি-তে যাকে বলা হয় কিয়োটো প্রটোকল। এই কিয়োটো প্রটোকলে বলা হলো যে উন্নত দেশগুলিকে ২০০৮ থেকে ২০১২-র মধ্যে তাদের ১৯৯০ সালে যা কার্বন নির্গমন ছিল তা থেকেও ৬-৮ শতাংশ কমাতে হবে, আমেরিকাকে কমাতে হবে ৭ শতাংশ। গরিব দেশগুলির কার্বন নির্গমন নিয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি।

এর মধ্যে চীনের প্রায় অবিশ্বাস্য দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন ও শিল্পায়ন কার্বন নির্গমনের হিসাবনিকাশ অনেকটাই পাল্টাতে থাকলো। ভারতও কিছুটা তাতে যুক্ত হলো।

ফলে আমেরিকা যা প্রথম থেকেই বলে আসছিল এবার ইউরোপ সেই কথাই তুললো— কার্বন নির্গমন কমানোর দায়িত্ব ধনী দরিদ্র সবাইকেই নিতে হবে। এরকম একটা চুক্তির জন্য চেষ্টা হলো ২০০৯ সালের কোপেনহেগেন সম্মেলনে, সেখানেও হাজির হয়েছিলেন বিশ্বের সব দেশের শীর্ষ নেতারা। সেখানে ধনী দরিদ্র সব দেশের কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব ঠিক করে একটি চুক্তি করবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চীন, ভারত ও অন্য গরিব দেশের আপত্তিতে তা করা যায়নি। কোপেনহেগেনের ব্যর্থতা কাটিয়ে আবার সেরকম একটি চুক্তি তৈরির প্রচেষ্টা চলছিল গত কয়েকটি সম্মেলনে। গত বছরের লিমা সম্মেলনে তা অনেকটা ঠিক হয়ে যায়, কারণ এতদিনের গরিব দেশের নেতা চীন দল পাল্টে আমেরিকার সঙ্গে জোট বাঁধে। অতঃপর প্যারিস সম্মেলন।

প্যারিসের ২১তম কনফারেন্স :

এবার আর কোপেনহেগেন হলে চলবে না, নতুন একটা চুক্তি করতেই হবে— এটাই ছিল প্যারিসের ২১তম কনফারেন্স অব পার্টিসের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৯৭-এ কিয়োটোর চুক্তির সময় থেকে আমেরিকার আপত্তি ছিল ধনী গরিবের দায়ের ভাগাভাগি নিয়ে। এই দায়ের প্রসঙ্গটি অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে কে কতটা কার্বন নির্গমন করছে, একেবারে ১৯৯২ থেকেই উঠে এসেছে। বিষয়টির দুটি দিক যথেষ্ট আলোচিত— কোন দেশ মোট কতটা কার্বন নির্গমন করছে এবং দেশের জনপ্রতি কার্বন নির্গমন কতটা। এই দু'টির নিরিখে একেবারে দু'রকম ছবি পাওয়া যাবে কারণ কোনো দেশের জনসংখ্যা অনেক হলে তার জনপ্রতি নির্গমন কম হলেও মোট নির্গমন অনেক বেশি হয়। যেমন ২০15 সালে চীন সবচেয়ে বেশি কার্বন নির্গমন করলেও জনপ্রতি কার্বন নির্গমনে তার স্থান ৪৯ তম। মোট নির্গমনে ভারতের স্থান চতুর্থ কিন্তু জনপ্রতি কার্বন নির্গমনে তার স্থান ১২১তম। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে ইউরোপের দেশগুলি তাদের কার্বন নির্গমন ১৯৯০-এর থেকে কম করতে সক্ষম হয়েছে এবং জনপ্রতি কার্বন নির্গমন কমেছে অনেকটাই। এমনকী আমেরিকার সাফল্য খুব কম হলেও তার জনপ্রতি কার্বন নির্গমন কুড়ি বছরে একটু কমেছে। কিন্তু চীন ভারত ব্রাজিল ইত্যাদি বড় উন্নয়নশীল দেশগুলির বর্ধমান কার্বন নির্গমন না কমাতে পারলে বিশ্ব উষ্ণায়ণ রোখার কাজটা করা যাবে না, এই চিন্তায় সবাইকে এই বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের দায় নিতে চুক্তিবদ্ধ করার কাজটা প্যারিসে করতেই হলো।

১১ ডিসেম্বর যে চুক্তিটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম খেটে (প্রায় প্রতিবার সম্মেলনে এরকম ঘটে, এতে প্রতিনিধিদের কর্মক্ষমতায় সন্দেহ জাগা উচিত না তাঁদের বাহবা দেওয়া উচিত বলা মুস্কিল) ১৯০টি দেশের প্রতিনিধিরা পাকা করলেন তার মূল কথা— বিশ্ব উষ্ণায়ণ কমানোর জন্য সবাই কিছু কিছু দায়িত্ব স্বেচ্ছায় ভাগ করে নিল। এই স্বেচ্ছা দায়িত্ব যার সরকারি নাম দেশ নির্ধারিত কাঙ্ক্ষিত নির্গমন (Intended Nationally Determined Contributions–INDC– দেনিকানি)। যার অর্থ হলো সব দেশ নিজেরাই আগামী বছরগুলিতে কতটা কার্বন নির্গমন করবে তার একটা হিসাব দেবে যাতে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রাক-শিল্পবিপ্লবের সময়ের তাপমাত্রার চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বৃদ্ধি না পায়। এর আগের বছরের লিমা সম্মেলনেই ঠিক হয়েছিল যে প্যারিস সম্মেলনের আগেই সবাই এই INDC বা দেনিকানি জানিয়ে দেবে। বেশিরভাগ দেশই তা জানিয়েছে এবং তা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এবার প্যারিস সম্মেলনের চুক্তি অবশ্য আরেকটু সক্রিয় হয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার লক্ষ্যও ঘোষণা করেছে। আর টাকাপয়সার ব্যাপার বলা হলো যে উন্নত দেশগুলি এই ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অর্থ সাহায্য করবে। অন্যান্য দেশকেও এই প্রথম বলা হলো স্বেচ্ছায় অর্থসাহায্য করতে।

ভারতও তার INDC রিপোর্ট জমা দিয়েছে। রিপোর্টটি অযথা কিছু চলতি পরিবেশ নিয়ে গালভরা কথা, ভারতীয় ঐতিহ্য, মহাত্মা গান্ধী ইত্যাদি দিয়ে পৃষ্ঠা ভরানো হয়েছে। এইসব বড়বড় কথার পর আমাদের অত্যন্ত লজ্জাজনক অস্তিত্বের কথাগুলি স্বীকার করে বলা হয়েছে যে ভারতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দরিদ্র লোকের বাস, সবচেয়ে বেশি লোকের ঘরে বিদ্যুৎ নেই, পানীয় জল নেই, জ্বালানির জন্য ব্যবহার করতে হয় কাঠকুটো ইত্যাদি। ভারতের জনপ্রতি বার্ষিক শক্তির ব্যবহার ০.৬ টন তৈল সমতুল (Ton oil equivalent বা toe), যেখানে পৃথিবীর গড় জনপ্রতি ১.৮৮ toe। ভারত মানব উন্নয়ন সূচকে অনেক পিছিয়ে ১৩৫ তম স্থানে এবং উন্নত জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন অন্তত জনপ্রতি ৪ toe। ফলে ভারতের এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই প্রাধান্য দিতে হবে এবং 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট'-এর পথে এগোতে হবে। এর জন্য যেসব বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রতি এককে শক্তি গাঢ়তা (energy intensity) ২০০৫ থেকে ২০১০-এর মধ্যে ১২ শতাংশ কমেছে। বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে যেমন আরো বেশি পুনর্নবীকরণযোগ্য ও অচিরাচরিত শক্তির (সৌর, বায়ু ইত্যাদি) ব্যবহার, শক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, অরণ্যায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০৫-এর অনুপাতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রতি এককে ৩০-৩৫ শতাংশ শক্তি গাঢ়তা কমাবে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ আসবে অ-জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। চীন তার INDC-তে বলেছে যে ২০৩০-এর মধ্যেই সে সর্বোচ্চ কার্বন নির্গমনে পৌঁছে যাবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০৫-এর অনুপাতে অভ্যন্তরীণ

১৯৯০—২০১৩-পৃথিবীতে কার্বন নির্গমনের পরিবর্তন

	১৯৯০		২০১৩		
উষ্ণায়ণকারী দেশ	কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন, (০০০, টন)	জনপ্রতি নির্গমন টন	কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন (০০০, টন)	জনপ্রতি নির্গমন টন	জনপ্রতি নির্গমনে টন
১. চীন	২৪৬০৭৪৪.০	২.২	১০,৩৩০,০০০	৭.৪	৪৯
২. আমেরিকা	৪৮২৩৫৫৭.১	১৯.৩	৫,৩০০,০০০	১৬.৬	১১
৩. ভারত	৬৯০৫৭৬.৮	০.৮	২,০৭০,০০০	১.৭	১২১
৪. রাশিয়া	২০৮১৮৪০.২		১,৮০০,০০০	১২.৬	১৭
৫. জাপান	১০৯৪২৮৭.৮	৮.৯	১,৩৬০,০০০	১০.৭	২৭
৬. জার্মানি	৯২৯৯৭৩.২		৮৪০,০০০	১০.২	৩২
৭. দক্ষিণ কোরিয়া	২৪৬৯৪৩.১	১২.১	৬৩০,০০০	১২.৭	২০
৮. কানাডা	৪৩৫১৮১.২	১৫.৭	৫৫০,০০০	১৫.৭	১৫
৯. বৃটেন	৫৫৫৯০২.৫	৯.৭	৪৮০,০০০	৭.৫	৪৩
১০. ফ্রান্স	৩৭৫৬৩২.৮	৬.৪	৩৭০,০০০	৫.৭	৬৮
১১. ইটালি	৪১৭৫৫০.৩	৭.৪	৩৯০,০০০	৬.৪	৫১

উৎপাদনের প্রতি এককে ৬০-৬৫ শতাংশ শক্তি গাঢ়তা কমাবে।

চুক্তি কিন্তু আইনি বাধ্যকতা নেই :

হৈচৈ করে এটিকে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি বলে ঘোষণা করা হলো, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করলেন ভারত যাতে চুক্তিতে সম্মত হয়, কিন্তু এই চুক্তির আইনি বাস্তবতা খুবই কম। বিশ্ব উষ্ণায়ণ কমানোর মূল হাতিয়ার হচ্ছে সব দেশের দেনিকানি বা স্বেচ্ছা নির্ধারিত ঘোষণাপত্র। এই ঘোষণাপত্রগুলি দেশগুলির কিছু আকাঙ্ক্ষার বিবরণ এবং ঘোষণা অনুযায়ী কার্বন নির্গমন না কমানো হলে সেই দেশকে বিচারের কাঠগড়ায় তোলার কোনো প্রস্তাব এই ঐতিহাসিক চুক্তিতে নেই। যদিও পাঁচ বছর পর এইসব ঘোষণা কতটা বাস্তবায়িত হলো তার হিসাব করা হবে, বছর বছর রিপোর্ট নেওয়া হবে কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। কারণ বেশিরভাগ ঘোষণাপত্রগুলিতে তাদের লক্ষ্যমাত্রার পৌঁছনোর জন্য সমস্যার বাধাগুলিরও উল্লেখ রয়েছে। ভারত বা চীন তাদের কার্বন নির্গমন কমানোর ব্যাপারটি বলেছে একটু অন্যভাবে। ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০৫-এর অনুপাতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রতি এককে ৩০-৩৫ শতাংশ শক্তি গাঢ়তা কমাবে। তবে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই লক্ষ্য পূরণ করতে দরকার হবে যথেষ্ট আন্তর্জাতিক সাহায্য। চীন তার INDC-তে বলেছে যে ২০৩০-এর মধ্যেই সে সর্বোচ্চ কার্বন নির্গমনে পৌঁছে যাবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০৫-এর অনুপাতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রতি এককে ৬০-৬৫ শতাংশ শক্তি গাঢ়তা কমাবে। রাশিয়ার ঘোষণাটি বেশ সতর্ক, বলা হয়েছে তার কার্বন নির্গমন কমানো নির্ভর করবে তার বনাঞ্চলের উপর। মালয়েশিয়া লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তার পূরণে দেশের অনেক সমস্যার বিবরণ দিয়েছে।

চুক্তির অর্থনৈতিক অংশটিও অস্পষ্ট। কারণ মূল চুক্তিতে অর্থনৈতিক সাহায্যের কোনো পরিমাণের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। এখানেও সদিচ্ছা প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে উন্নত দেশগুলি বিভিন্নভাবে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে। এর আগের সম্মেলনে বলা হয়েছিল যে ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর দশ হাজার কোটি ডলার (ছয় লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকা) সাহায্যের একটি তহবিল গড়া হবে। কথাটি চুক্তির মুখবন্ধে উল্লেখ থাকলেও চুক্তির মূল অংশে এর পরিমাণ নিয়ে কিছু বলা হয়নি। সুতরাং যে অর্থ সাহায্যের ভরসায় উন্নয়নশীল দেশ কাজে নামবে তার কোনো আইনি সংস্থান রাখা হয়নি।

এরকম একটি দুর্বল চুক্তি দুটি উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। এক, তা না হলে সব দেশকে পাওয়া যেত না। দুই, এই চুক্তিতে কোনো কিছুর আইনি বাধ্যতা না থাকায় এটিকে আমেরিকার সংসদের অনুমতি নিতে হবে না। ফলে রাষ্ট্রপতি ওবামার এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় বাধা হবে না। এই চুক্তির 'ঐতিহাসিক' জয় মানসিক।

১৯৯৭-র কিয়োটো চুক্তিতে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করে দেশগুলির নাম করেই রাখা হয়েছিল আর দরিদ্র দেশের কোনো দায়ভাগ ছিল না। প্যারিসে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের কথা বারংবার উল্লেখ করলেও চুক্তিতে কে উন্নত আর কে উন্নয়নশীল তা বলা নেই এবং উষ্ণায়ণের দায়ভাগে সবার কিছু করবার সম্মতি আদায় করা গেছে।

ভারত কী করবে :

১৯৯৫-এর পর যখন থেকে এইসব সম্মেলন শুরু, তখন থেকে চীন এক বিস্ময়কর উন্নয়নযজ্ঞে নেমেছে আর সেই যজ্ঞের ঘৃতাহুতিতে নির্গত হয়েছে বিপুল পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড। পঁচিশ বছরেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে পিছনে ফেলে কার্বন নির্গমনে সবার আগে চীন। ভারতের সঙ্গে কোনো তুলনা প্রায় বাতুলতা মাত্র। ২০০০ সাল থেকে চীনের উন্নয়নের রথ চলেছে অত্যন্ত দ্রুত। ইউরোপের নির্গমন কমেছে, দেরিতে হলেও আমেরিকাও কমিয়েছে। অথচ এর মধ্যেই পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎপাদনেও চীন বিশ্বের প্রথম সারিতে। চীন এজন্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট’, ‘গ্রিন এনার্জি’ ইত্যাদি অনেক কথা বলেছে কিন্তু প্রতি বছরে আশি হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছে— যা করতে ভারতের লাগে প্রায় দশ বছর। এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের বেশিরভাগটাই এসেছে কয়লা পুড়িয়ে যা পরিবেশবাদীদের একেবারে এক নম্বর শত্রু। এর জন্য চীনের পরিবেশের কিছু ক্ষতি হলেও এই সময়ে চীন সত্তর কোটি মানুষকে দারিদ্র্যমুক্ত করেছে।

তাহলে এখন নেতৃত্বের দায় ভারতের— যা প্যারিসে সম্মেলনে ভারত ততটা করে উঠতে পারেনি--- যদিও পশ্চিমি মাধ্যম ভারতকে চুক্তিতে বাগড়া দেবার জন্য সবসময় দায়ী করেছে। ভারত তার দেনিকানি বা আইএনডিসি-তে পরিষ্কার বলেছে যে সে বড় দরিদ্র দেশ, তার উন্নয়নের গতি শ্লথ করা সম্ভব নয়। আর তার প্রয়োজন বিদেশি প্রযুক্তি ও অর্থ সাহায্য। ভারতকে নিতে হবে চীনের পথ। আমরা সম্মেলনে সম্মেলনে চুক্তির সমর্থন করবো কিন্তু চীনের মতন দ্রুতগতিতে আমাদের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাব। মনে রাখতে হবে এই চুক্তির আইনি কোনো দাঁত-নখ নেই।

মনে রাখা ভালো যে বিশ্ব উষ্ণায়ণ নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিতর্ক এখন খুবই প্রাসঙ্গিক। হাজার কোটি ডলারের হাতছানিতে এনজিও থেকে গরিব দেশের বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সব কথা মেনে নিলেও আমাদের গরিব দেশের চোখকান খোলা রাখতে হবে। পরিবেশের জন্য বছরে দশ হাজার কোটি ডলার আন্তর্জাতিক অর্থ চলে গেলে দারিদ্র্য দূরীকরণের অর্থ যোগান থাকবে তো?

(লেখক একজন পরিবেশবিদ)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) : ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন : ২৪১৫-৩৫৬৬

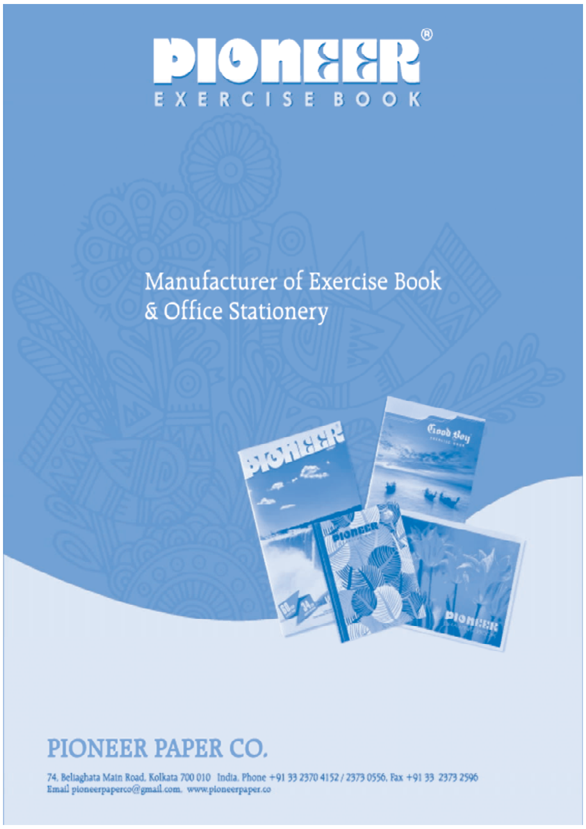

চিঠিপত্র

বিপন্ন হিন্দু শরণার্থী

দেশ ভাগের সময় দেশের নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বিপন্ন হয়ে হিন্দুরা এদেশে এলে ভারত তাদের আশ্রয় দিতে বাধ্য। কিন্তু তাঁদের সেই প্রতিশ্রুতি ভুলুণ্ঠিত। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে আগত বিপন্ন হিন্দুরা এখন অস্তিত্ব সঙ্কটে নিমজ্জিত। বাংলাদেশ বা ভারত কোথাও তাদের শান্তিতে থাকার ঠাঁই নেই।

১৯৭১ সালের মার্চে বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে আগত শরণার্থীদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে এক নোটিফিকেশন জারি করে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার। ১৯৭১ সালের ২৯ নভেম্বর ইন্দিরা সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা সেই নোটিফিকেশনে পরিষ্কার বলা হয়েছে— "১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের (মধ্যরাত) পর পূর্বপাকিস্তান থেকে যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, শরণার্থী হিসেবে তাদের নাম নথিভুক্ত করা হবে, কিন্তু তাদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। কিছু সময়ের জন্য পূর্ববঙ্গের লোকদের ভারতে থাকতে দেওয়া হবে, পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফিরে যেতে হবে।" শরণার্থী পরিচয়ে হিন্দুদের জন্য ইন্দিরাজী পৃথক কোনো সংস্থান রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর পুত্র প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী অসমের জাতীয়তাবাদীদের চাপে ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট 'অসম চুক্তি' নামে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সেই সময়কাল থেকে শরণার্থীরা (এমনকী স্থায়ী বাসিন্দারাও) ডি-ভোটার, ডিটেনশন্ ক্যাম্প, ট্রাইব্যুনাল, বহিষ্কার-সহ বিভিন্ন প্রকার লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী এই সমাজ তথা সরকার তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সুপ্রিমকোর্টের তত্ত্বাবধানে তাদের সর্বশেষ সংযোজন 'রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীর উন্নীতকরণ (এন আর সি) অসম'। ১৯৭১-এর ২৪ মার্চের (মধ্যরাত) আগের নামগুলি এন আর সি-তে নথিভুক্ত করে বাকিদের বিদেশি বলে ঘোষণা করা হয়। সেই ভয়াবহ অবস্থার কথা ভেবে ৪৪/৪৫ বছর আগে আসা লোকগুলি এখন দিশেহারা অবস্থায় দিন যাপন করছে।

অথচ একই অবস্থার পটভূমিতে পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীরা অবলীলায় পেয়ে যাচ্ছে ভারতের নাগরিকত্ব। ধর্মীয় কারণে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে যারা ভারতে এসেছে তাদের রাজস্থান, পাঞ্জাব, গুজরাটে ঠাঁই হয়েছে। তারা নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে জারি করা সেই নোটিফিকেশনে পাকিস্তানের শরণার্থীদের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মনমোহন সিং বলেছিলেন, বাংলাদেশ থেকে যারা অত্যাচারের শিকার হয়ে অসমে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করা উচিত। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শিলচরের এক বিশাল সমাবেশে গুজরাটের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন— "বিজেপি ক্ষমতায় এলে বিলুপ্ত হবে 'ডি'-ভোটার প্রথা, তুলে দেওয়া হবে ডিটেনশন ক্যাম্প, বাংলাদেশে অত্যাচারিত হয়ে আসা হিন্দুরা ভারতে স্থান পাবেন। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীরা বিদেশি হিসাবে চিহ্নিত হবেন।" তাঁর এই আশ্বাসবাণীতে ভরসা রেখে হতভাগ্যরা এখনও ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আছে।

এন আর সি নবীকরণ করতে গিয়ে সম্প্রতি ২০১৪ সালের ভোটার তালিকাকে গ্রহণ করার যে দাবি উঠেছিল তাও দেশের সর্বোচ্চ আদালতে গ্রহণযোগ্য হয়নি। বর্তমানে আইন সংশোধনই একমাত্র পথ। আইন সংশোধন বা আইন প্রণয়ন আইন প্রণেতাদের কাজ। তাদেরকেই এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। মোদীজী কী তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন— বর্তমানে এটাই হলো সবথেকে বড় প্রশ্ন। বরাক তথা অসমের বাঙালিরা বাস্তব অর্থে নেতৃত্বহীন। অতীতে অসমের বাঙালিদের বিপদে আমরা পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি। ১৯৬০-এর 'বঙাল খেদা আন্দোলনে' পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এটা ভেবে এখনই পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বশীল নেতাদের সক্রিয় হওয়া উচিত। ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৭১-এর সেই নোটিফিকেশন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থীদের জন্যও শুভ বার্তা বহন করছে না।

—জহরলাল পাল,
লিঙ্করোড, শিলচর, অসম।

কুরু-পাণ্ডবদের বংশপরিচয়

রাজকুমার জাজোদিয়ার জিজ্ঞাসা ছিল— মহাভারতের কুরু- পাণ্ডবরা কী ঋগ্বেদে বর্ণিত 'ভরত' গোষ্ঠীর বংশধর? (চিঠিপত্র, ২৬.৫.১৪)। আমি যেটুকু জানতে পেরেছি, তাতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুত্র, ভারতের নবম বংশধর কুরু এবং চতুর্দশ বংশধর শান্তনু।

কুরুদের বংশপরিচয় : বৈবস্বত মনুর মেয়ে ইলা ও চন্দ্রের ছেলে বুধের পুত্র পুরুরবা। এইভাবে, বৈবস্বত মনু (১)—ইলা (২)—পুরুরবা (৩) —যযাতি (৬)—পুরু (৭)--- দুষ্যন্ত (২১)--- ভরত (২২)---সংবরণ (৩১) ---কুরু (৩২) ---অর্জুন (৫৩) ---অভিমন্যু (৫৪) ---পরীক্ষিৎ (৫৫) ---জন্মেজয় (৫৬) —নিচক্ষু (৬০) —উদয়ন (৭৯) —ক্ষেমক (৮৪)। শেষ রাজা ক্ষেমক। বংশটি কৌরব, পৌরব, ভারত বা চন্দ্রবংশ নামেও পরিচিত। পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানগণ—পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্র— আসলে কৌরবই ছিলেন। (সূত্র : 'পৌরাণিকা'--- অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

উল্লেখ্য, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর 'মহাভারতের গাইড' ('সারদা প্রকাশন, ৩৩এ, রামকৃষ্ণ স্ট্রিট, হুগলী-৭১২২৫৮) গ্রন্থে এ বিষয়ে আরও বিশদ জানা যাবে।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

সঠিক স্থানে অর্থ সঞ্চয় করুন

লক্ষ্মী দাস

সঞ্চয় কথাটার সঙ্গে আমরা ছোটোবেলা থেকেই পরিচিত প্রায় সবাই। ছোটোবেলায় দেখতাম মাকে মা-লক্ষ্মীর ফোটোর পাশে একটা ছোটো ভাঁড় রাখতে আর প্রত্যেক বৃহস্পতিবার তাতে কম বেশি কিছু পয়সা রাখতেন। আবার দুপুরে ও রাতে চাল নেওয়ার সময় কিছু চাল তুলে মঙ্গলঘটে রাখতেন। সেই দেখেই সঞ্চয় করা কিছুটা শেখা। তাই বাবা, কাকা, মামা এরা যখনই কিছু পয়সা দিতেন তখন মাটির ভাঁড়ে তা জমাতাম, আর একটু বেশি হলেই তা দিয়ে নানারকম পছন্দের জিনিস কিনতাম। অর্থাৎ একটু করে পয়সা জমানো আমরা ছোটো থেকেই শিখেছি। ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রত্যেকের আয় অনুযায়ী কম বেশি সঞ্চয় করা উচিত। আমাদের আজকের সঞ্চয় ভবিষ্যতে চলার সঙ্গী। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসের কথা আমরা প্রায় সকলেই জানি কিন্তু বর্তমানে ওই ব্যাঙ্ক পোস্ট অফিস ছাড়াও অনেক চিটফান্ড গজিয়ে উঠেছে। তারা বেশি সুদ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে মানুষের কষ্টের সঞ্চয়টা কৌশল করে ছিনিয়ে নিয়ে কিছুদিন পরেই ফেরার হয়ে যায়।

বর্তমানে মানুষ এতটাই কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, নিজের কষ্টের সঞ্চয়কে একটু কষ্ট করে ব্যাঙ্কে বা পোস্ট অফিসে না রেখে অতি অনায়াসে অন্যকে বিশ্বাস করে তা আত্মসাৎ করার সুযোগ করে দেয়। একটু খুলে বললে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায় যে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী মানুষকে রাতারাতি ধনী করে দেওয়ার লোভ দেখায় এবং সেটা এতটাই সুপরিকল্পিতভাবে পরিবেশন করে যে সাধারণ মানুষ অতি সহজেই বিশ্বাস করে এবং তাদের ফাঁদে পা দিয়ে বসে। তারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, প্রতি মাসে নিজেরা এসে ইনস্টলমেন্ট বা প্রিমিয়াম নিয়ে যাবে। কষ্ট করে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হবে না। শুধু তাই নয়, আপনার টাকার বিনিময়ে ব্যাঙ্ক, এল আই সি কিংবা পোস্ট অফিসের চেয়েও বেশি সুদে টাকা দেবে। এই অসাধু ব্যবসায়ীরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অফিস খুলে বসে, তাতে বেশ কিছু ছেলে-মেয়েকে এজেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করে থাকে এবং কীভাবে মানুষের কাছ থেকে টাকা বের করে আনা যায় তার প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করে থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা নেহাত কম নয়, তাই চাকরির লোভে তারাও সাধারণ মানুষকে বোকা বানাবার খেলায় সামিল হয়। এইভাবে প্রায় ২/৩ বছর চলার পর হঠাৎ করে শোনা যায় তারা অফিসে তালা লাগিয়ে ফেরার হয়েছে। যারা এজেন্টের কাজ করছিল তাদের ৫/৬ মাসের বেতন বাকি। আর যারা টাকা জমা দিয়েছিলেন তাদের চোখের জলই সম্বল।

যারা বেতনভোগী কর্মচারী ছিল তারা বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারে না। কারণ তাদেরকে প্রথমত, নিয়মিত ভালো বেতন দেওয়া হয়, দ্বিতীয়ত, তারা মানুষের কাছ থেকে যত বেশি টাকা তুলে দিতে পারবে তার ওপর মোটা কমিশন পাবে। তাছাড়া তাদের মনোরঞ্জনের জন্য মাসে একবার করে পার্টি, বেড়ানোর সুব্যবস্থা ছাড়াও থাকে নানারকম উপহার সামগ্রী। তারা মানুষের মনে এমন বিশ্বাস তৈরি করে যাতে এই দুষ্ট কাজকর্মের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না জন্মায়। যখন মোটামুটিভাবে বিশ্বস্ততা তৈরি হয় খেলাটা তখনই শুরু হয়। ধীরে ধীরে কর্মচারীদের বেতন অনিয়মিত হতে থাকে। এইভাবে যখনই বেশ কিছু মোটা অর্থ তাদের হাতে এসে যায় তখনই কোম্পানি বন্ধ করে এরা পালায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের টাকা আর ফিরে আসে না। আর যারা কর্মচারী হিসাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নানা কৌশলে টাকা আদায় করেছিল, তাদের অবস্থা হয় সঙ্গীন। বেতন না পাওয়ায় আর্থিক অনটন, অশান্তি তার ওপর সাধারণ মানুষের টাকা ফেরতের চাপ। এই দোটানায় পড়ে অনেকেই আত্মহত্যা করে বসে, কেউ বা গণধোলাইয়ের শিকার হয়।

এখন মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই অসাধু ব্যবসায়ীরা কীভাবে দেশে গজিয়ে উঠছে? নিশ্চয়ই এদের ব্যবসার পিছনে রাজনৈতিক দলগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে। কারণ যেকোনো বড় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের মদত না থাকলে অত সহজে সাফল্য পেতে পারে না। নেতারা একদিকে সামাজিক কাজকর্মের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চাইছেন আবার অন্যদিকে অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অসামাজিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে সাহায্য করছেন। তাহলে কোথায় গিয়ে বাঁচবেন।

তাহলে প্রশ্ন আসতেই পারে সঞ্চয় করা কি নিরাপদ নয় বা কোথায় টাকা সঞ্চয় করা নিরাপদ? প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস যে পরিমাণ সুদ দেয় অন্যরা কীভাবে তার চেয়ে বেশি সুদ দেবে। আবার যখনই কোনো বিশেষ সুবিধা কেউ দেবে তখন নিজেকে প্রশ্ন করুন কেন দেবে? আপনাকে কেন তারা এত সুবিধা দেবে, আজকের দিনে স্বার্থ ছাড়া কেউ কোনো কাজ করে না। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কেন তবে সেই সুবিধা দিচ্ছে না। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যা দিতে অপারগ তা এরা কীভাবে দেবে? কোথাও টাকা রাখার আগে ভেবে দেখুন আপনার কষ্ট করে উপার্জন করা অর্থ কোনো ভুল জায়গায় রাখছেন না তো?

আপনার সঞ্চয় যদি ভবিষ্যতে আপনার কাজেই না লাগে তবে সঞ্চয় করে কী লাভ। আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ আপনাদের প্রতারণা করছে না তো? তাই পারিপার্শ্বিকের দিকে নজর রাখুন, বোঝার চেষ্টা করুন, সচেতন হন আর সঠিক জায়গায় সঞ্চয় করুন। সরলতা ভাল কিন্তু বোকামি ভালো নয়। ■

কাশ্মীরের পবিত্র তীর্থ
হরমুখ গঙ্গা

রিনি রায়

হাজার হাজার বছরের শাশ্বত সনাতন ধারায় সম্পৃক্ত ভারতভূমির সর্বত্র অনুভব করা যায় দেবতাদের উপস্থিতি। এদেশের মাটি, পাহাড়, নদী-নালা, জলাশয়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে সেই দৈবী সত্তা। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে অসম— হেন জায়গা নেই যেখানে এই উপস্থিতি ভক্তজনের মনকে উদ্বেল করে তোলেনি। দেবপদধূলি ধন্য এদেশের মাটি যেমন অপূর্ব, অপ্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার, কাশ্মীর এই দেবভূমির স্বর্গ—ভূস্বর্গ।

ভূস্বর্গের ইতি উতি ছড়িয়ে রয়েছে দেবতাদের উপস্থিতির চিহ্ন— আবাসস্থল, যা

পরম্পরা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে এক নিবিড় ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। আর কালক্রমে তাকে কেন্দ্র করেই কোন্ সেই অজানা সময় থেকে মানুষ সেথায় গড়ে তুলেছে তাঁদের আরাধনা স্থল। উত্তর কাশ্মীরে অবস্থিত হরমুখ-গঙ্গাবাল এমনই এক স্বল্পপরিচিত শৈবক্ষেত্র।

হরমুখ পর্বতের পাদদেশে প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট গঙ্গাবাল হ্রদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই তীর্থক্ষেত্র। হিন্দু ধর্মানুযায়ী এই পর্বত ও তৎসংলগ্ন হ্রদ হলো মহাদেব ও পার্বতীর আবাসস্থল। হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন এই তীর্থক্ষেত্রকে 'নীলমত পুরাণ' ও কলহন রচিত 'রাজতরঙ্গিণী'তে একে কাশ্মীরের পবিত্রতম তীর্থস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শতাব্দী প্রাচীন এই পবিত্রস্থানে এককালে প্রায়ই ভক্ত সমাগম হলেও বিগত একশো বছর ধরে কিছু অসুবিধার কারণে তা স্থগিত ছিল। অবশেষে ২০০৯ সালে গঙ্গাবাল ট্রাস্টের উদ্যোগে আবার এই পাণ্ডব বর্জিত পথে মানুষের পায়ের ছাপ পড়ে।

গঙ্গাবাল যাত্রা মূলত শুরু হয় শ্রীনগর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কঙ্গন তহশিলের নরনাগ নামক এক ছোট্ট গ্রাম থেকে। তবে নামেই তা শুধু গ্রাম— চতুর্দিকে ধ্বংসের চিহ্ন আর বুকভর্তি হাহাকার নিয়ে বিষণ্ণ রমণীর মতো অতীতের সুসময়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নরনাগ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে কারাকোটা রাজবংশীয় নরপতি ললিতাদিত্য মুক্তিপিড়র সময়ে এস্থান প্রসিদ্ধ মন্দির শহরের গৌরব অর্জন করেছিল। সেই রাজবংশের শাসকেরা তাঁদের রাজধানী পরিহাসপুর (বর্তমান পামপুর) থেকে প্রত্যহ মহাদেবের পূজা করতে এখানে আসতেন। বর্তমানে এই জায়গাটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীন হলেও সর্বত্র অযত্নের ছাপ মনকে খানিকটা বিষণ্ণ করে তোলে। কিন্তু নদীর কলতান আর দেবদারুর সবুজ সমারোহ সমস্ত হতাশাকে যেন এক লহমায় মুছিয়ে দেয়।

তীর্থযাত্রীরা ছড়ি পূজা দিয়ে এই তীর্থযাত্রার শুরু করেন। তারপর ব্যোমকেশের নাম স্মরণ করে এগিয়ে যান সম্মুখস্থ 'বুথশের' পর্বতচূড়ার দিকে। সামনের ঘন পথ বড়ই বন্ধুর কিন্তু ঘন সবুজ অরণ্যানী, ঝিকমিকে ঝরনা, পাখির কলতান, মেঘের সঙ্গ; আঁকাবাঁকা পথ এই দুর্গম পথের শ্রান্তিকে যেন খানিকটা লাঘব করে দেয়। অবশেষে কয়েক ঘণ্টা হেঁটে নন্দকুল হ্রদ পার করে নীলাভ হরমুখ হ্রদের তীরে এসে শেষ হয় তীর্থযাত্রীদের চলার পথ। প্রসঙ্গক্রমে নন্দকুলের আধ্যাত্মিক আখ্যান বর্ণনা না করলে হয়তো এই বিবরণ খানিকটা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে এই হ্রদে কাল অর্থাৎ শিব এবং তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর নন্দী বাস করেন। হ্রদের পরিসীমা বরাবর সবুজ রঙ নন্দীর এবং হ্রদ কেন্দ্রস্থ নীল রঙ মহাদেবের প্রতীক বলে মনে করা হয়। কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রম শেষে গঙ্গাবাল হ্রদের দর্শন তীর্থযাত্রীদের মনে এক শান্তি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি তৈরি করে। সমুদ্র সমতল থেকে ১৩,৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত এই হ্রদ হরমুখ গঙ্গা নামেও পরিচিত। পাহাড়ের উপর থেকে আগত বহুধা বিভক্ত নদীর স্রোত দেখে মনে হয় যেন শিবের জটা থেকে স্রোতস্বিনী গঙ্গা মর্ত্যে অবতরণ করছেন। এ এক অপূর্ব দৃশ্য যা মনকে অনাবিল আনন্দে পরিপূর্ণ করে তোলে। অনুভূত করায় প্রকৃতি মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের অর্থাৎ আগত তীর্থযাত্রীদের চির নাড়ির যোগ। ■

হিন্দু ধর্ম-ই সনাতন ধর্ম

সৌমেন নিয়োগী

সনাতন হিন্দুধর্মকে বুঝতে গেলে সবার আগে জড় ও জীব এই দুই প্রকার বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃত সংজ্ঞা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। বস্তু বলতে জড় ও জীব উভয়কেই বোঝায়। এই বস্তু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে মূলত দুই প্রকার। (১) দিব্য বস্তু (২) শরবিকার বস্তু।

দিব্য বস্তু : যে বস্তুর শরবিকার নেই যেমন— জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ— আত্মা, প্রাণ, বেদ, স্থান ইত্যাদি। যাঁরা দিব্যবস্তুতে বিশ্বাসী তাদেরকে বলে আস্তিক। ভগবান বুদ্ধ দিব্যবস্তুতে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই জন্যই তিনি আস্তিক, কিন্তু ব্যক্তি-ঈশ্বরের বিশ্বাসী ছিলেন না বলে নিরীশ্বরবাদী।

শরবিকার বস্তু : যে সকল বস্তু শরবিকার যুক্ত অর্থাৎ জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ইত্যাদি হয় অর্থাৎ প্রকৃত বস্তু Physics, Chemistry, Mathematics ও Biology ছাড়া অন্যকিছুকে বিশ্বাস করে না এবং $E=mc^2$ -র মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই সকল বস্তুকেই শরবিকার বস্তু বলে। যাঁরা $E=mc^2$ ভিন্ন চিন্তা করতে বা মানতে অক্ষম তাঁদেরকে বলা হয় নাস্তিক। দিব্যবস্তু মনে অসীম That is unlimited। যেহেতু অসীম অর্থাৎ মৌলিক, তাই এঁকে সসীমের মধ্যে That is within limits সংজ্ঞাতীত করা সম্ভব নয়। যেহেতুক আত্মা, প্রাণ, কাল, স্থান ইত্যাদি অত্যন্ত মৌলিক এবং এদের সংজ্ঞা যথার্থভাবে দেওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ এরা দিব্য বস্তু। সনাতন ধর্ম হলো সেই মত যা মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এটির কোনো প্রবক্তা নেই অর্থাৎ প্রফেট বিহীন That is without beginer. Veda is the begining, which in turn has no begining. এই শাশ্বত সত্যে অধিষ্ঠিত মতকেই সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম বলা হয়েছে। এখানে Influx এবং Deflux দুই-ই হয়েছে। যা কোথাও বা কারুর মধ্যে গৃহীত, ফলে সাধারণ গুণাবলী বৈশিষ্ট্য সাধারণ ভাবে বর্তমান।

আমাদের শরীরে দিব্যবস্তু আছে যাকে আত্মা বলা হয় এবং যা শরবিকার শূন্য। এই আত্মা দেহ পরিবর্তন করেন। অর্থাৎ জড় ও জীবের বস্তুর মধ্যে আছেন। এর প্রকৃতি That is nature নিয়ে পাঁচরকমের ভাষ্য আছে যাকে বলা হয় জন্মান্তর।

প্রত্যেক আত্মা যতক্ষণ জীবের মধ্যে থাকে সে উদ্ভিদ বা পশু যাই হোক না কেন তাকে জীবাত্মা বা প্রতজ্ঞআত্মা বলে। হিন্দু মাত্রেই জন্মান্তর এবং আত্মা এই দুইয়েই বিশ্বাসী। সামান্যতম পরিবর্তন কিছু কিছু সবাই গ্রহণ করে নেয়।

যেখানে মৃত্যু আছে সেই জগৎটাকে বলা হয় মরজগত মরজগতে বস্তুর জন্মান্তর হয়। প্রত্যেক প্রাতজ্ঞ আত্মাই এক কালে মৃত্যুহীন জগৎ অর্থাৎ চিন্ময় জগতে অধিষ্ঠিত ছিল। মায়া নামক কোনো রহস্যময় কারণে জীবাত্মা মরজগতে প্রবেশ করে। মায়ার স্বরূপ কোনো প্রাকৃত ব্যক্তি (Materialistic/ অজ্ঞানী ব্যক্তি) দ্বারা জানা সম্ভব নয়।

এই মায়ার বন্ধন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যু চক্রে ভুগতে হয়। এই চক্রাকার বন্ধন ছিন্ন হলে তবেই চিন্ময় জগতে প্রবেশ করা যায়। যেখানে জন্ম মৃত্যু নেই। সমস্ত দুঃখের কারণ মৃত্যু। জন্ম জন্মান্তরকে একটি প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়। মায়ার পাশে আবদ্ধ জীবকে বলা হয় অজ্ঞানী জীব; মায়ার যার ছেদ হয়েছে তাঁকে জ্ঞানী বলে। তিনি জন্ম, মৃত্যুরহিত এবং চিন্ময় জগতে অবস্থান করেন। যেমনটি দীপ নিভে যাওয়াকে বলে নির্বাপিত হওয়া সমান নির্বাণ, অতএব চিন্ময় জগতে প্রবেশের নাম বৈদান্তিক মতে ব্রহ্ম নির্বাণ বা বৌদ্ধ মতে নির্বাণ। স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই উপনিষদের জ্ঞানকে অভীক বলতেন। অর্থাৎ ভয়শূন্যতা অর্থাৎ নির্ভীকতা যা কেবল উপনিষদ অধ্যয়ন ও উপলব্ধি দ্বারা সম্ভব।

হিন্দু মাত্রই কারণ অর্ণব, কারণহীন আনন্দে বিশ্বাসী। হিন্দু প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত। (১) সনাতন হিন্দু (২) অনুসারী হিন্দু বা Auxillary Hindu শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম। তবে দেবতত্ত্ব বিষয়ে বৌদ্ধ ও জৈনরা মানলেও ব্রাহ্মরা মানেন না। কর্ম মাত্রই ফল প্রসবিনী এবং প্রত্যেক কাজের পেছনে কারণ থাকে। অসুখ হলে মৃত্যু, জন্ম হলে মৃত্যু হবে, তাই মৃত্যুর কারণ জন্ম নেওয়া। মরজগতে কারণবিহীন কার্য হয় না। কারণ অনন্ত (Infinite)। প্রলয়কালে কারণ সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। মূল ধারণায় একে সমুদ্রের সাথে তুলনা করা হয় বলেই একে কারণ অর্ণব বা কারণ সমুদ্র বলা হয়। কারণ সমুদ্রের অতিক্রান্ত জগৎকে অক্ষয় জগৎ বলে। বৈষ্ণবরা বলে বৈকুণ্ঠ। সেখানে যা কিছু স্থিত তা কারণবিহীন।

মরজগতে মনুষ্যের যে হর্ষ, উল্লাস, দুঃখ ইত্যাদি হয় তার পিছনে কোনো বহিঃকারণ আছে। উদাহরণ হিসেবে, চাকরিতে উন্নতি হলো, ঘুষের টাকা পেলাম আনন্দ হলো, কারণ হলো মৃত্যু। ভয় হলো এগুলির সকারণ আনন্দ বা দুঃখ। অজ্ঞানী ব্যক্তির কাছে সমস্ত সুখ দুঃখের মূল হলো কারণ। এই কারণেরই

প্রভু হলেন ঈশ্বর। সাংকেতিক ভাবেই এই কারণ সমুদ্রে শায়িত বিষ্ণু ও মরজগতের স্রষ্টা হচ্ছে ব্রহ্মা বা প্রজাপতি যা উপনিষদে হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত। হিরণ্য অর্থাৎ সোনা। ইনি বিষ্ণুর দ্বারা সৃষ্ট, অতএব নাভিপদ্মে জন্ম বলেই ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা হিরণগর্ভ বলে অভিহিত। কারণ সমুদ্রের বাইরে যা বিরাজ করছে সেটি অকারণ বা কারণহীন বা অদ্বৈত্ব যার Duality শূন্য। যেমন জন্মের বিপরীত মৃত্যু। দিনের থেকে রাত্রি আসে, আনন্দ আছে বলেই দুঃখ। সবই Dual দ্বৈত। কিন্তু শুধুই আনন্দ যেখানে বিরাজমান অর্থাৎ নিরানন্দ বিহীন। এই রকম মরজগত বা খরজগত হয় না। কারণ বর্হিস্থ কারণ নেই, তবে আনন্দ আছে এও হয় না। কিন্তু অক্ষর জগৎ বৈকুণ্ঠ, শুধুই আনন্দ, তার কোনো কারণ আনন্দ বা বর্হিস্থ কারণ নেই। নিরানন্দও নেই। শঙ্করপন্থীরা এই বৈকুণ্ঠকেই নির্বাণ বলে, সাধারণ লোকে বলে ঈশ্বরপ্রাপ্তি হলো।

জীবনের উদ্দেশ্য কী :

Material জগতে অর্থাৎ বাস্তব জগতে কোনো পণ্ডিত জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পান না। নিম্নস্তরের লোকের কাছে 'eat drink and be marry'. সংস্কৃতে যাকে বলে আহার, নিদ্রা, মৈথুন হলো জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভারতীয় ঋষি জীবনে একটিমাত্র উদ্দেশ্য আছে তা হলো ঈশ্বর প্রাপ্তি। নির্বাণ বা বৈকুণ্ঠলাভ। ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। অর্থাৎ স্বর্ণ-প্রসবিনী। কারণ, তিনি সৃষ্টির রচনা করেছেন। যার গর্ভ থেকে সৃষ্টি নামক স্বর্ণ প্রসবিত হয় তাকেই হিরণ্যগর্ভ বলে।

ঈশ্বর ও আত্মার স্বরূপ :

সমস্ত শরীরটি মেটিরিয়াল বা খর বস্তু দিয়ে তৈরি, অতএব তার ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু এই দেহের ভিতরে একটি দিব্যবস্তু বা অক্ষর বা Divine বস্তু আছে যা ধ্বংস হয় না। তাঁকে বলে আত্মা, ইংরেজিতে বলে Soul। মুসলমান সম্প্রদায় বলে রুহ। মৃত্যুকালে আত্মা দেহত্যাগ করে এবং কর্মফল অনুযায়ী ঊর্ধ্বগতি বা নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়। ঊর্ধ্বগতি দুই প্রকার— (১) ক্রমউন্নয়ন বা Stagewise Uplifment, এতে মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে যায়।

পুণ্যফল শেষ হলে স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে প্রথিত হয়। আবার অখণ্ড পুণ্যফল থাকলে সে ত্রিভুবন পার হয়ে মহঃ, তপঃ, জনঃ, সত্য প্রভৃতি লোকে যায়। এখানে পৌছলে আর মরলোকে ফিরতে হয় না। একেই শঙ্করাচার্য বলেছেন ক্রমমুক্তি। সরাসরি বা সাক্ষাৎ মুক্তি। এতে চোদ্দ ভুবন পার হয়ে ব্রহ্মলোকে বা বৈকুণ্ঠে উপনীত হয়। এরূপ ব্যক্তি অতিশয় দুর্লভ। চৈতন্য মহাপ্রভু প্রমুখ সাক্ষাৎ মুক্তি পান বা পেয়ে থাকেন। নিম্নগতির মধ্যে অর্থাৎ যারা কুকর্ম করে সেই কুকর্ম ফলস্বরূপ মৃত্যুর পর অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যথা পশু, পক্ষী বৃক্ষ ইত্যাদি। ঋষি অরবিন্দ প্রমুখ ঋষির মতে ইট, কাঠ, পাথর প্রভৃতি জড়বস্তুতেও পরিণত হতে পারে। তবে হ্যাঁ কর্মফল কেবলমাত্র মনুষ্য- লোকে, পশু জীবের মধ্যে নয়।

কর্মতত্ত্ব : কর্ম মাত্রই ফল প্রসবিনী। কর্মফল সুকর্ম, কুকর্ম বা মিত্র হতে পারে। কিন্তু কর্ম সর্বদায়ী ফল প্রসব করে। কর্ম কেবল মনুষ্যই করে পশুপাখি করে না। মুক্তি পেতে হলে মনুষ্যকে কর্ম করতে হবে। কিন্তু কর্মফল গায়ে লাগবে না। এরূপ ব্যক্তি মুক্তিলাভের যোগ্য হয়। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা কাজকর্ম করবে অথচ কর্মফল আশ্রয় নেবে না অর্থাৎ ie. touch করবে না, তাকেই বলে যোগ। শাস্ত্র উক্তি অনুসারে 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'। যোগের নানা বিভাগ আছে। যেমন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ (ধ্যানযোগ) প্রভৃতি।

হিন্দুধর্মের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তার যুগোপযোগিতা। যার ফলে সে সর্বদাই অতিথি পরায়ণ, সহিষ্ণু, সমন্বয়ী হয়। তার ব্যাপ্তি সময়ের পরিভাষায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এর থেকেই তার সঠিক সংজ্ঞা কারুর পক্ষে কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা অত্যন্ত দুরূহ। আমরা হিন্দুধর্মের মধ্যে যে ষড়দর্শনের উল্লেখ পাই তা বিভিন্ন ঋষির মুনি ও বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাধনার ফসল। এটি সেই সাধনা যার ইংরেজি প্রতিশব্দ সঠিক ভাবে পাওয়া যায় না। তাই হিন্দু ধর্মের সহিষ্ণুতা তার এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের ব্যাপ্তিকে সর্বব্যাপী হিসাবে প্রতিভাত করে। তথাপি তার পথের অনুসারী হওয়ার জন্য বিশেষ গোড়ামি নেই। হিন্দুধর্ম ঈশ্বর প্রাপ্তির কোনো একটি মাত্র পথের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না বলেই এটা খুব স্বাভাবিক। প্রাচীন মহিম্ন স্তোত্রে আছে, 'হে প্রভু! বেদ, সাংখ্য, যোগ্য, পাশুপত, বৈষ্ণব— এই সব পথ তোমার কাছেই নিয়ে যায়। যেমন আঁকাবাঁকা নদীর ধারা অবশেষে সাগরে গিয়ে মেশে।' বস্তুত হিন্দুধর্মের যদি কোনো বাণী থাকে তবে তা এই— তিনি অনন্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু নানা জনের কাছে তিনি নানা রূপে দেখা দিতে পারেন। ▮

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

গল্প

নবাঙ্কুর

ব্যাঘ্র বিদায়

বিরাজ নারায়ণ রায়

নিধিরামপুরের জমিদার হরেন্দ্রধর স্যান্যাল। তার দাপটে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। টুঁ শব্দ করতে পারে না প্রজারা। পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া বিশাল জমিদারি। বিরাট অট্টালিকা, ভরা সংসার। নায়েব মুরুব্বি চাকর ভৃত্য সবাইকে নিয়ে গমগম করে। এই নিয়ে বিলাস-ব্যসনে বেশ কেটে যাচ্ছিল দিন।

একবার এক আজব শখ হলো জমিদার মশাইয়ের। তার ইচ্ছে হলো যে তিনি একটি বাঘ পুষবেন। সভাসদদের ডেকে তিনি এই কথা বললেন। সবাই তো শুনে বাঃ বাঃ করল। বৃদ্ধ নায়েব আর এককাঠি এগিয়ে বলল— ‘কত্তামশায়, আপনি অ্যাদ্দিন একটি কাজের কাজ করতে চলেছেন। এতো বড়ো জমিদারি, একটি বাঘ না পুষলে কি আর জমিদার বাড়ির মর্যাদা থাকে।’ এই কথা শুনে জমিদারমশাই খুশিতে ডগমগ হয়ে পড়লেন।

প্রজাদের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগলো না। পণ্ডিতেরা শুনে হাসলো। নিন্দুকেরা নিন্দে করে বেড়াতে লাগলো। তাতে অবশ্য জমিদারের কিছু যায় আসে না। তিনি বাঘ পুষবেনই, এই কথার আর কোনো নড়চড় হবে না। কিন্তু সমস্যা হলো এমন বাঘ পাবেন কোথায়! বাঘ হলো জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ার। তাকে পোষ মানানো কী আর চাট্টিখানি কথা! জমিদারমশাই ঠাকুমার কাছে শুনেছেন— তার পূর্বপুরুষরা নাকি শিকারে যেত। বাঘ হাতি আরো কত কি না শিকার করেছে। কিন্তু হরেন্দ্রধর সে পথ কখনো মাড়ায়নি। চারিদিকে খোঁজ শুরু হলো, কোথায় পাওয়া যায় পোষার মতো বাঘ। অর্থের তো অভাব নেই। তাই যেভাবেই হোক বাঘ তার চাই। সেপাইদের তো কালঘাম ছুটে গেল। বাঘ আর পাওয়া যায় না। এদিকে জমিদারমশাইয়ের আর তর সয় না।

এমন সময় একদিন সকাবেলা এক চাষি এসে হাজির। সবে ঘুম ভেঙেছে জমিদারের। চোখ রগড়ে বললেন— কী চাই এতো সকাল সকাল? চাষি হাত কচলে বলল— ‘আজ্ঞে কত্তা আমি বিক্রমপুর জমিদারি থেকে এসেছি। শুনেছি আপনি নাকি একটি বাঘের খোঁজ করছিলেন।’ বাঘের কথা শুনেই হরেন্দ্রধর চনমনে হয়ে উঠলো, বলল— ‘আছে নাকি তোর কাছে সেই খোঁজ?’ চাষি আবার হাত কচলে উত্তর দিল— ‘আমার কাছে একটি পোষা বাঘ আছে বটে, কিন্তু আপনি কি তা পুষতে পারবেন?’ এই কথা শুনে জমিদার হরেন্দ্রধর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন— ‘ব্যাটা বলিস কী, আমি পারবো না তো তোর ওই বিক্রমপুরের জমিদার পারবে।’ ভয়ে চাষি দু’পা পিছিয়ে গেল, বলল— ‘কত্তা আমার বাঘের যে অনেক নিয়ম আছে। ব্রাহ্মণ বাঘ কিনা। সেইটাই বলছিলাম।’ তখনই ঘরে ঢুকলো নায়েবমশাই, সে খিঁচিয়ে উঠলো— ‘তা বল না তোর বাঘের কী নিয়ম।’ তারপর চাষি যে কথা বলল তা শুনে জমিদারের চক্ষু চড়কগাছ।

তার বাঘ নাকি বড় সাত্ত্বিক। আমিষ পাতে নেয় না। জমিদার বললেন— ‘বাঘ যে নিরামিষাশী হয় তা তো বাপের জন্মে শুনিনি।’ নায়েব পাশ থেকে বলল— ‘ব্যাটা গুল মারছিস না তো?’ চাষি হাত জোড় করল, বলল— ‘দেবতুল্য মানুষ আপনারা, মিথ্যে বলতে পারি। কিন্তু একটা আর্জি আছে কত্তা, অভয় দেন তো বলি।’

নিরামিষ কী আমিষ তা ভাবার ধৈর্য এখন জমিদার মশাইয়ের নেই। অনেক কষ্টে মিলেছে, তা কোনো মতেই হাতছাড়া করা যাবে না। হরেন্দ্রধর ঘাড় নাড়লে চাষি তার আর্জি জানাল— ‘কত্তা ঘরে আমার জোয়ান মেয়ে আছে, অর্থের অভাবে বিয়ে দিতে পারছি না। আপনি যদি তার ব্যবস্থা করে দেন তো...।’ নায়েব আবার খিঁচিয়ে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল, জমিদার মশাই তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন— ‘নায়েব মশাই’ ওর মেয়ের বিয়ের জন্য যা অর্থ লাগবে দিয়ে দিন। আর সেপাই-বরকন্দাজদের বলুন বাঘকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুক।’ এদিকে গিন্নিকেও খবরটা পাঠালেন যাতে বাঘকে স্বাগত জানাবার কোনো ত্রুটি না থাকে।

জমিদার মশাইয়ের নির্দেশ মতো পরের দিনই বাঘ আনার ব্যবস্থা হলো। সকাল সকাল গোরুর গাড়ি পাঠানো হলো বিক্রমপুর। সঙ্গে জনাদশেক সেপাই। গ্রাম জুড়ে রব পড়ে গেল— বাঘ আসছে, বাঘ আসছে বলে। বিকেল নাগাদ যথাসময়ে

গোরুর গাড়িতে করে বাঘ আনা হলো। তাই দেখতে মানুষের ভিড় জমে গেল রাস্তার দু-দিকে। গ্রামের বাচ্চারা সব গাড়ির পিছে পিছে। জমিদার হরেন্দ্রধরের কাছে খবরটা যেতেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন গিন্নিকে। জমিদার বাড়ির উঠোনে এসে গাড়ি লাগলো। ছাউনির ভিতর বাঘ বসে। কৌতূহলী চোখে সে এদিক ওদিক দেখছে। গিন্নি ধানদুব্বো দিয়ে বরণ করলেন বাঘকে। সে এক হই হই কাণ্ড।

বাঘ নিরামিষাশী। তাই জমিদারের নির্দেশে সেদিন বাড়ির সবার জন্য নিরামিষ রান্না হলো। বাঘের জন্যও এলাহি ব্যবস্থা। বেশ উৎসব উৎসব ব্যাপার। কিন্তু গণ্ডগোলটা শুরু হলো পরের দিন থেকে।

দুপুরবেলা স্নান আহ্নিক সেরে হরেন্দ্রধর খেতে বসেছেন। বাঘবাবাজীর খাওয়া হয়ে গেছে, তিনি এখন চৌকির উপর থাবা ছড়িয়ে বসে হাই তুলছেন। দাসীরা রান্নাঘর থেকে খাবার আনছে, গিন্নী নিজে হাতে খাবার বেড়ে দিচ্ছেন। দু'রকমের মাছ, পাঠার মাংস দিয়ে জব্বর আমিষ পদ। জমিদার খাওয়া শুরু করতেই বাঘের নজর পড়ল সেই দিকে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে জমিদারের দিকে। হরেন্দ্রধর মাছের মুড়োটা মুখে দেবেন এমন সময় বাঘবাবাজী হালুম করে উঠলো, চোখ দু'টি যেন জ্বলছে। তারপর চৌকি থেকে একলাফে নেমে জমিদারের সামনে গিয়ে পড়লো। ততক্ষণে জমিদারের আত্মারাম খাঁচাছাড়া। প্রায় মুর্চ্ছা যায়। ঠকঠক করে কাঁপছেন। দাসীরা চিৎকার করে সব ফেলে পালিয়ে গেল। গোটা বাড়িতে পালাও পালাও রব। সেপাইরা সব ছুটে এলো। বাঘ তখনও গরর্ গরর্ করছে। দৃষ্টি জমিদারের দিকে। শেষে অনেক চেষ্টায় বাঘকে শান্ত করা গেল। জমিদারের সেদিন আর খাওয়া হলো না।

বাঘের এই আচরণে হরেন্দ্রধর ভীষণ দুঃখ পেলেন। তার সাধের বাঘ তাকেই কিনা আক্রমণ করলো। না এ মানা যায় না। নায়েব বলল— 'বলেছিলুম না ব্যাটা গুল মারছে। বাঘ কখনও নিরামিষ খায় তা হয়। ও নিশ্চয় মাংসের গন্ধ পেয়েই এই কাজ করেছে।' তখন নায়েবের পরামর্শে বাঘকে আমিষ খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন হরেন্দ্রধর। কিন্তু তাতে বিপত্তি আরো বেড়ে গেল। যে সেপাই মাংস দিতে গেছে বাঘ মাংস না খেয়ে তাকেই আক্রমণ করে বসলো। সেই থেকে কেউ বাঘের কাছে ঘেঁসতে চায় না। জমিদারও সাহস করে না, সে এক মহা বিপদ। সবাই ভাবতে বসলো কী করা যায়।

অবশেষে ডাক পড়ল সেই চাষির। চাষির তো ভয়ে থরহরি কম্প। জমিদার না তাকে শূলে চড়ায়! হরেন্দ্রধর গম্ভীরভাবে বললেন— 'ব্যাটা তুই না বলেছিলি বাঘ নাকি খুব সাত্ত্বিক। তাহলে এই ফ্যাসাদ কেন?' চাষি নিজেকে সামলে মিষ্টি করে জমিদারকে উল্টো জিজ্ঞেস করল— 'আজ্ঞে জমিদার মশাইয়ের কি আমিষ ভোজন করা হয়?' এই শুনে হরেন্দ্রধর তো চটে লাল। চিৎকার করে বললেন— 'আমি কি বিধবা যে আমিষ খাব না?' চাষি আবার আগের মতো হাত কচলালো, বলল— 'কত্তা দোষ নেবেন না। আমার বাঘকে যেমন নিরামিষ খাওয়াতে হয় তেমনি বাঘের মালিককেও নিরামিষ খেতে হয়।' নায়েব লাফিয়ে উঠল— 'ব্যাটা জোচ্চর, তা আগে একথা বলিসনি কেন? তুই কি জমিদার মশাইকে জানে মারতে চাস? ক্ষত্রিয় বংশ সে কিনা নিরামিষ খাবে।' জমিদার হরেন্দ্রধর রাগে কাঁপছেন, নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। সেপাই ডেকে চাষিকে দূর করে দিতে বললেন। সেপাইরা তৎক্ষণাৎ চাষিকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল।

তারপর থেকে হরেন্দ্রধরের মন ভালো নেই। এদিকে বাঘের উৎপাত দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমিষাশী লোক দেখলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বাড়ির বাচ্চারাও ছাড় পাচ্ছে না। সবার মনেই আতঙ্ক। মহা চিন্তায় পড়লেন জমিদার। তারপর একদিন নায়েবকে ডেকে বললেন— 'নায়েব মশায়, কী করা যায় বল তো দেখি? এ তো আর সহ্য হয় না।' নায়েব জমিদারের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইলো, তারপর একগাল হেসে বলল— 'এক কাজ করলে ব্যাটা চাষিকে কিন্তু ভারি জব্দ করা যায়। অনুমতি করেন তো বলি।' জমিদার উদগ্রীব হয়ে বলল— 'সেটা কিরকম?' নায়েব বলল— 'বাঘটিকে খাঁচাবন্দী করে আবার চাষির বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দিন। ব্যাটা নিজের ভাত জোটাতে পারে না তখন দেখা যাবে কি করে বাঘের খাবার জোটায়।'

নায়েবের পরামর্শ মতো বাঘকে ফেরত পাঠাবার তোড়জোড় শুরু হলো। একটা বাক্স তৈরি করে বাঘকে তাতে ঢোকানো হলো। তারপর গোরুর গাড়িতে তুলে আগের থেকে দ্বিগুণ সেপাইসহ বাঘকে ফেরত পাঠানো হলো। জমিদার নিজেই গ্রামের শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন তার সাধের বাঘকে। এইভাবে ব্যাঘ্র বিদায় সম্পন্ন করে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন নিধিরামপুরের জমিদার হরেন্দ্রধর স্যান্যাল।

নারী সমাজকে আধুনিকমনস্ক করতে মহিলা সম্পাদিত পত্রপত্রিকা

শুভশ্রী দাস

কোনো কোনো গবেষকের মতে বাংলার নারী জাগরণের ঢেউ নাকি ইদানীংকালে প্রবল হয়েছে। এর শুরু হয়েছিল কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতকেই। তখন বাংলায় একাধিক নারী পরিচালিত পত্রপত্রিকা মেয়েদের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছিল। সেখানে তারা নিজেদের কথা লিখত। তাতে সমাজ ব্যবস্থার অচলায়তনেও ধাক্কা লাগত বটে। এর আগেই অবশ্য নারীশিক্ষার প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। মেয়েরা নিজেদের উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকা নিজেরাই শুরু করে দিয়েছিল।

মহিলা পরিচালিত ও সম্পাদিত প্রথম পাক্ষিক পত্রিকাটির নাম **বঙ্গমহিলা**। ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ (ইংরেজি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) এটি প্রকাশিত হয়। কলকাতার খিদিরপুর নিবাসী মোক্ষদাসুন্দরী মুখোপাধ্যায় এটি সম্পাদনা করেন।

দ্বিতীয় পাক্ষিক পত্রিকাটি হলো **হিন্দুললনা**। ব্যারাকপুরের নবাবগঞ্জ থেকে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এর কেউ সম্পাদিকা ছিলেন না। এই পত্রিকায় বাল্যবিবাহের কুফল বর্ণনা করে সমাজকে সচেতন করেন রানীবালা দেবী।

মহিলা পরিচালিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকাটির নাম **বঙ্গবাসিনী**। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কুমুদবালা দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

অনাথিনী মহিলা সম্পাদিত প্রথম মাসিক পত্রিকা। ১২৮২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৭৫, জুলাই) প্রকাশিত হয়।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত **ভারতী** পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল নাম। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পরে ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী ও হিরন্ময়ী দেবী এর সম্পাদক হয়েছিলেন।

পরিচারিকা'র প্রথম সম্পাদক যদিও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। পরে কেশবচন্দ্র সেনের পুত্রবধূ মোহিনীদেবী সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। তারপর অল্প সময় ময়ূরভঞ্জের মহারানী সুচারুদেবী, কোচবিহারের রানী নিরুপমাদেবী সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় পণপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করে 'বর বিক্রয়' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে আছে— ''চিনি, শোরা, পাট কিংবা কোম্পানির কাগজের মতো এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মধ্যে বিবাহের বাজারে ভাল ভাল পাস করা ছেলের বাজারদর বাড়াইয়া যাইতেছে।'' পত্রিকাটি ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ১ জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত হয়।

সোহাগিনী একটি মাসিক পত্রিকা। প্রকাশিত হয় ১২৯১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। ইংরেজি ১৮৮৪ সালে। দু'জন সম্পাদনা করতেন— কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় **বালক** পত্রিকা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন সম্পাদিকা।

সুশীলাবালা দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হোত **বিরহিণী**। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও খৃষ্টীয় মহিলা, পুণ্য, অন্তঃপুর এই সময়কালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের মহিলা পরিচালিত পত্রিকার মধ্যে ১৩০২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ে উদ্যোগ ও শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় **মুকুল** পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ছ'বছর পর সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন হেমলতা দেবী। এই পত্রিকায় 'নারীশিক্ষা' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশিত হয়।

১৩১২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে **ভারত মহিলা** প্রকাশিত হয় সরযূবালা দেবীর সম্পাদনায়। এই পত্রিকায় 'শিক্ষিতা নারী অসতী কি?' নামে একটি প্রবন্ধ সেকালে খুব শোরগোল তুলেছিল। লেখিকা নলিনীবালা দেবী।

১৩১১ বঙ্গাব্দে **জাহ্নবী** পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরে এর সম্পাদিকা হন অশ্রুকণা দেবী।

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর সম্পাদনায় **বয়য়িত্রী** পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দে।

১৩১৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে **সুপ্রভাত** প্রকাশিত হয়। সম্পাদিকা ছিলেন কুমুদিনী মিত্র।

শান্তিময়ী দেবীর সম্পাদনায় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে **গৃহলক্ষ্মী** প্রকাশিত হয়।

যোগমায়া মাতাজী তপস্বিনীর সম্পাদনায় **ভারতলক্ষ্মী** পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে।

মাহিষ্য সমাজের মেয়েদের জাগরণের জন্য ১৩১৮ বঙ্গাব্দে **মাহিষ্য মহিলা** প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণভাবিনী দেবী সম্পাদিকা ছিলেন।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে মুসলমান নারী জাগরণের লক্ষ্যে **জাগরণ** প্রকাশিত হয়। সুলতানা বেগম সম্পাদিকা ছিলেন।

অর্চনা প্রকাশিত হয় ১৩১০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। পরে এর সম্পাদিকা হন চিত্রিতা দেবী।

মনোরঞ্জন ও সঙ্গীত বিষয় **সঙ্গীত বিষয়িণী মাসিক পত্রিকা** ১৩২০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। ইন্দিরা দেবী সম্পাদিকা ছিলেন।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে **প্রেম ও জীবন** পত্রিকা প্রকাশিত হয় হেমলতা দেবীর সম্পাদনায়। বিগত শতাব্দীর শেষলগ্ন থেকে মহিলা পরিচালিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বর্তমান শতাব্দীতে আরো উন্নতমানের পত্রপত্রিকার সম্পাদনা শুরু হয়েছে। **সানন্দা** এখন ঘরের মেয়ে-বউদের অবশ্যপাঠ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে বড়ে কথা, মেয়েরা এখন নিজেরাই নিজেদের কথা লিখছেন নিজেদের পত্রপত্রিকায়। নারী সমাজের আধুনিকতার সঙ্গে তাল মেলানোয় এর থেকে বড় মাধ্যম আর কী হতে পারে। ■

সংস্কার ও সাধনা

অতিথি কলম

রঙ্গাহরি

সংস্কার ধর্মের মতো একটি শব্দ, যার ইংরেজি অনুবাদ করা শক্ত। কিন্তু ভারতে সব প্রান্তের শহর ও গ্রামবাসী এর অর্থ বোঝেন। বিভিন্ন ভাষার শব্দগুচ্ছে সংস্কার স্থান করে নিয়েছে। ধর্মগ্রন্থের 'ষোড়শ সংস্কারের' কথা সকলের জানা।

আমরা যখন সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা করছি তখন ধর্মীয় ষোড়শ সংস্কারের কথা না বলে ব্যক্তিজীবন নির্মাণের জন্য সংস্কারের কথা বলাই ভাল। সকলেই জানে, যে সংস্কার পাঠ্যক্রমের দ্বারা শেখানো যায় না। আচরণ দ্বারা অভ্যাস করতে হয়। অবশ্যই এর জন্য পাঠ্যক্রম,ইতিহাস, বোধকথা, প্রবচন, জ্ঞানযজ্ঞ, উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চা প্রয়োজন। আচরণ দ্বারা তা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কার প্রক্রিয়ার জন্য মাতা-পিতা, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব, গ্রাম্যসমাজ ইত্যাদি বিভিন্ন জীবন্ত মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সদগুণ উপনয়ন : সমাজ হলো সংস্কৃতির ক্ষেত্র এবং সংস্কার প্রাপ্ত করার মাধ্যম হলো ব্যক্তি, অতএব মনুষ্য সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির সংস্কার প্রয়োজন। ভারতে এই কাজ মনোবিজ্ঞান, দৃষ্টান্ত, অনুকরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে হয়। এর সিদ্ধান্ত ভগবদ্‌গীতাতে বর্ণিত হয়েছে— 'শ্রেষ্ঠ পুরুষরা যা যা আচরণ করেন সাধারণ লোক তেমনই আচরণ করে। তাঁরা যা কিছু প্রমাণ করেন, সাধারণ মনুষ্য সমাজ তদনুসার ব্যবহার করে।' (৩/২১)। একেই সংস্কার প্রক্রিয়া বলে। ব্যক্তি নির্মাণের যে জীবন্ত প্রক্রিয়া আছে তাকে মনীষীগণ সংস্কারসাধন প্রক্রিয়া বলেছেন এবং তার পরিণামকে বলেছেন সংস্কার। তাঁদের পরিভাষায় সংস্কার হলো যা সদ্‌গুণ বিকশিত করে ও দুর্গুণ বিদূরিত করে।

> কোনো দেশের সংস্কৃতির কথা বলা হয়, তার অর্থ এই নয় যে এটা সেখানকার রাজাদের সংস্কৃতি, ধনী ব্যবসায়ীদের সংস্কৃতি বা পড়াশুনা জানা বিদ্বান লোকেদের সংস্কৃতি। সংস্কৃতির উপর কোনো বিশেষ ব্যক্তির অধিকার নেই, অধিকার সকলের। এই সংস্কৃতি থেকে রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রভাবিত ও প্রদীপ্ত হয়। তাঁরা সকলেই হয়ে যায় রাষ্ট্রীয়। রাষ্ট্রের সমস্ত নরনারী হলো সংস্কৃতির ছায়া।

সদ্‌গুণ উপনয়ন ও দুর্গুণ অপনয়ন— এই হলো সংস্কার। এই দুটি কাজ একই কাজের দুটি দিক। উদাহরণস্বরূপ, জলযন্ত্র খালি পাত্রকে নীচে নিয়ে যায় ও ভরা পাত্রকে ওপর নিয়ে আসে। সংস্কৃত সাহিত্যে একে বলে— 'কূপযন্ত্রঘটিকান্যায়'। সংস্কার দেওয়ার পদ্ধতি যান্ত্রিক হতে পারে না। এর স্বরূপ বেশিরভাগই মনোবৈজ্ঞানিক। তার রীতি হলো, মনুষ্য নিজের মধ্যে নিহিত তিনটি গুণের ভরসায় নিজেকে বিকশিত করে। যথা, নিরীক্ষণ, অনুকরণ ও আত্মীকরণ (আত্মসাৎ করার ক্ষমতা)।

সংস্কার কোথা থেকে পাওয়া যায় : এই তথ্যের ভিত্তিতে সংস্কার প্রদানকারী প্রথম সক্ষম মাধ্যম হলো মনুষ্য। এর মধ্যে মাতাপিতা, শিক্ষক, মহাপুরুষ, গুরুজন, বন্ধু, আত্মীয় ইত্যাদি। সংস্কার প্রদানকারীর মধ্যে এই সকলের প্রভাব থাকে। এছাড়াও সাধু-সন্ত, মহাত্মা, পরিব্রাজক, ধর্মাচার্য, প্রবচনকারী, কীর্তনীয়া প্রমুখের প্রভাবও স্মরণীয়। তাঁদের সৎসঙ্গ, সদুপদেশ, সুচিতাপূর্ণ আচরণ, নিষ্কাম কর্ম, তপোনিষ্ঠা ইত্যাদির পরিণামে মানুষ নিজের থেকেই সংস্কার গ্রহণ করে সুসংস্কৃত হয়।

এরকমই জোরালো মাধ্যম হলো মনীষীদের মূল্যবান সাহিত্য। যদিও মুদ্রিত ও লিখিত সামগ্রীর নিজস্ব প্রাণ নেই, তবুও তার স্রষ্টাও পাঠকের চেতনাযুক্ত অন্তকরণের পক্ষে প্রভাবী মাধ্যম হতে পারে। আমাদের সমাজে গ্রন্থ-পরায়ণ প্রথা চালু আছে। পেটের দায়ে মজদুরি করার জন্য ভারতবর্ষের যে সমস্ত নিরক্ষর মানুষ মরিশাস, ফিজি, গয়ানা চলে গেছেন এই প্রথাই তাঁদের সুসংস্কৃত রেখেছে। তাঁদের শ্রুতি-স্মৃতি, পুরাণ বলতে একমাত্র রামচরিতমানস। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় তাঁরা তা ধরে রেখেছেন। এই সমস্ত সংস্কারের প্রভাবেই অন্য দেশে থেকেও ভারতবংশীরা নিজেদের অস্মিতা বজায় রেখেছে এবং উন্নতির চরম শিখরে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

ভজন কীর্তন : সংস্কার পদ্ধতিতে ভজন-কীর্তনের মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্বোত্তর ভারতে কীভাবে চেতনা জাগ্রত করেছেন তা সকলেরই জানা। মোগল আমলে মহারাষ্ট্রে সন্ত তুকারাম ভজন কীর্তনের মাধ্যমেই সমাজে আস্থা জাগিয়ে রেখেছিলেন। ভজন কীর্তনে বিভোর গায়ক শ্রোতাদের মনে নিজের প্রভাব বিস্তার করেন। ফলে তাদের ওপর

সংস্কারের প্রবাহ অবিরাম চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের আসরে গান গাওয়ার প্রচলন ছিল। ওই সময় তিনি প্রায়ই সমাধিস্থ হতেন। এই দৈবী অনুভূতির সান্নিধ্য সবচেয়ে বেশি লাভ করেছেন নরেন্দ্রনাথ যিনি পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছেন।

সংস্কারের মাধ্যমে মনুষ্যকে সভ্য করতে সঙ্গীত, সাহিত্য, কলা'র অনেক ভূমিকা আছে। একজন প্রাচীন কবি বলেছেন, যে মানুষ সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলা থেকে বঞ্চিত, সে হলো শিং ও লেজবিহীন পশু। এই তিনটি বিষয়কে ইংরেজিতে Fine Arts বলে। এর দ্বারা মানুষ সংস্কারিত হয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা এই তিনটি বিষয়কে সংস্কারের জীবন্ত মাধ্যম করে গেছেন। মন্দিরে বিশেষত উৎসবের সময় যখন ভক্তদের ভিড় হয় তখন সকলের ধর্মীয় জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ভাব জাগরণের জন্য এই তিনটি বিষয়ের সদুপযোগ করা হয়েছে। এর দ্বারা নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষও সংস্কারিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে। এই বিশাল দেশের বিভিন্ন অংশে যক্ষগান, কথাকলি, মোহিনীয়াট্টম, কর্ণাটক সঙ্গীত, ভরতনাট্যম, মণিপুরী নৃত্য, রাস, গরবা, রামলীলা ইত্যাদি এই সত্যের সাক্ষী হয়ে আছে।

বাতাবরণ : বাতাবরণ বা পরিবেশ নির্মাণের ক্ষেত্রে মন্দিরের মতো আরও সংস্থা তৈরি হয়েছে। যেমন— বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, আশ্রম, গুরুকুল ইত্যাদি। এই সমস্ত সংস্থার দ্বারা সাধারণ মানুষ সংস্কারিত হয়। এই সংস্থাগুলিতে বসবাসকারী প্রবীণগণ নিজেদের আচরণের দ্বারা সংস্কার দিয়ে থাকেন। জীবনে ঘনিষ্ঠ সংস্কার পাওয়ার আর এক প্রধান মাধ্যম হলো পরিবেশ। এটা অন্তর্নিহিত, চোখে পড়ে না। কিন্তু তার অস্তিত্ব অমান্য করা যায় না। যদি কোনো গ্রামের অল্পসংখ্যক লোকও এই মাধ্যম দ্বারা সংস্কারিত হয় এবং নিজের গ্রামে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সদাচারী জীবন যাপন করে, তার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার কারণে সম্পূর্ণ গ্রামের পরিবেশ স্বচ্ছ ও সৃজনশীল হয়ে যায়। নির্মল বাতাস গ্রহণ করে যেমন মানুষ সুস্থ ও নীরোগ থাকে তেমনই শুদ্ধ ও সংস্কারিত পরিবেশে জীবনযাপন করলে গ্রামের মানুষ নিজেই সংস্কারিত হতে পারে। এখানে সংস্কার কাউকে বলতে বা দেখাতে হবে না। পরিবেশের দ্বারাই সুগন্ধের মতো সংস্কারও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

গ্রামে বিদ্যমান এই সংস্কারক্ষম পরিবেশ কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য হয় না। অনেক সংস্কারযুক্ত ব্যক্তির সম্মিলিত সার্থক জীবনের পরিণামে হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এতে ক্রমাগত ও বিরামহীনতা দরকার হয়। সংস্কারিত ব্যক্তি মারা যায় কিন্তু সংস্কারিত সমাজ স্থায়ী হয়। মরণশীল মনুষ্য দ্বারা তৈরি সমাজ হয় অমর। তাই সম্পূর্ণ গ্রামের সঞ্চিত সংস্কারও অমর ও প্রবহমান।

সংস্কৃতি ও সংস্কার : একে সাধারণত আমরা ব্যবহারিক ভাবে সংস্কৃতি বলি। মূলত সংস্কার ব্যক্তির; সংস্কৃতি সমাজের। আসলে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই। পার্থক্য আছে ব্যবহারের মধ্যে। মালায়ালম ভাষাতে দুটোকেই 'সংস্কার' বলা হয়। সর্বজনীনভাবে যাকে সংস্কৃতি বলে তার একক রূপ সংস্কার এবং সংস্কারের সম্মিলিতরূপ সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি একটি দেশ বা জনসমুদায়ের উন্নতির পরিচায়ক। এটা সরকারি আইন বা প্রশাসনিক ঘোষণা ছাড়াই সর্বসাধরণ মানুষের আচরণের দ্বারা প্রকাশ পেতে পারে। যখন চীনের পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতে এসেছিলেন, দেখেছিলেন ভারতবর্ষের মানুষ সত্যবাদী। নিজের দেশে ফিরে গিয়ে তিনি বলেছিলেন— ভারতে চুরি-ডাকাতি নেই, সকলে সত্য আচরণ করে। একইভাবে যখন ভারত থেকে কম্বু, কোণ্ডিন্য, রাজেন্দ্র চোল সাগর পার করে পূবের দেশে যান এবং সেখানকার রাজা, রানী, সাধারণ জনতা তাঁদের আক্রমণকারী হিসাবে না দেখে উৎকর্ষকারী হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁরা নবীন আগন্তুককে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজেদের স্থানে ও মনে গ্রহণ করেন।

অবিরাম প্রক্রিয়া : যখনই কোনো দেশের সংস্কৃতির কথা বলা হয়, তার অর্থ এই নয় যে এটা সেখানকার রাজাদের সংস্কৃতি, ধনী ব্যবসায়ীদের সংস্কৃতি বা পড়াশুনা জানা বিদ্বান লোকেদের সংস্কৃতি। সংস্কৃতির উপর কোনো বিশেষ ব্যক্তির অধিকার নেই, অধিকার সকলের। এই সংস্কৃতি থেকে রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রভাবিত ও প্রদীপ্ত হয়। তাঁরা সকলেই হয়ে যান রাষ্ট্রীয়। রাষ্ট্রের সমস্ত নরনারী হলো সংস্কৃতির ছায়া।

সংস্কৃতি হলো মানবজাতির। এর প্রক্রিয়া কবে কোথায় প্রারম্ভ হয়েছে বলা কঠিন। এর স্রোত মানুষের প্রকৃতি থেকে প্রগতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার নৈসর্গিক প্রেরণা। এর কেন্দ্রে কেনো ব্যক্তি বা বিশেষ শ্রেণী থাকতে পারে না। এর উৎপত্তি ও বিকাশ নদীর মতো। গঙ্গার উৎপত্তিস্থল গোমুখ হলেও গঙ্গাসাগর পর্যন্ত দীর্ঘপথে বহু ছোট বড় নদী মিলিত হয়েছে। বিন্ধ্যাচলের সোনভদ্র এবং হিমাচলের গণ্ডকীও তার সঙ্গে মিলেছে।

সংস্কৃতির উৎকর্ষতাও সেইরকম। ভারতবর্ষের কথা বলতে গেলে হাজার বছর পূর্বে বৈদিক মহর্ষি থেকে বর্তমান যুগের বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি এর ধারক, বাহক ও কর্তা। জ্ঞানী, বীর, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য অনুসারে জীবনমুখী শাশ্বত মূল্যবোধ রেখে গেছেন। সমাজ ওই সমস্ত মূল্যবোধগুলিকে অনায়াসে আত্মসাৎ করে সংস্কৃতি বানিয়ে নিয়েছে। পরিণামস্বরূপ প্রত্যেক প্রজন্ম নিজেই সংস্কৃত হয়ে সংস্কৃতি সৃষ্টির হেতু হয়েছে। যেমন পথিক চলতে চলতে পথের নির্মাতা হয়ে যায়।

এখানে একথা বললে ভুল হবে যে, সংস্কৃতি এই প্রক্রিয়ার অন্তিম পরিণতি। আসলে সংস্কৃতি পরিণতি নয়, এক গতিশীল বিরামহীন প্রক্রিয়া। এর কুরীতিগুলি থেকে মুক্ত হয়ে অভিনব মূল্যবোধগুলিকে যুগোপযোগী পরিপুষ্ট করার দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের। সবশেষে, সংস্কৃতি হলো চলমান প্রজন্মের অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধগুলির অবিরল ও অক্ষয় প্রবাহ। প্রত্যেক প্রজন্মের মনের মালিনতা দূর করে সত্যশুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধি সম্পন্ন করার অদ্বিতীয় ক্ষমতা সংস্কারের মধ্যে আছে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক)

বিশেষ নিবন্ধ

বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও পরিবেশ দূষণ

ড. অভিজিৎ মুখার্জি

পনেরো বছর আগে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লুউ বুশকে সতর্ক করে বলেছিল যে পরিবেশ দূষণ ও বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ণের ফলে পৃথিবীতে যে সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে, তা আণবিক মহাযুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে। বুশসাহেব তাতে কর্ণপাত করেছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু বিগত পনেরো বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর্যালোচনা করে আমরা কি সেই অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রমাণ দেখতে পারছি না?

এক এক করে যদি বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক ঘটনাপ্রবাহের অনুসন্ধান করা যায় তাহলে অতি সম্প্রতি চেন্নাই অঞ্চলের ভয়াবহ অতি বর্ষার দুর্যোগ দিয়ে শুরু করা উচিত, যে বর্ষার প্রকোপ মানুষ শতবর্ষেও দেখেনি। তার আগে আমরা শুধু ভারতবর্ষেই একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখেছি--- যথা, উত্তরাখণ্ডের বন্যা যার ফলে কেদার-বদরী সম্পূর্ণ জলমগ্ন ও বিধ্বস্ত হয়েছিল, মুম্বইয়ের ২০০৫-এর জুলাই মাসের একদিনের ভয়ঙ্কর বর্ষা ও প্লাবন যার ফলে হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু ও মহানগরীর সম্পূর্ণ বিপর্যয় এবং কলকাতা মহানগরীর বছরের পর বছর ক্ষণস্থায়ী অতিবৃষ্টি ও তজ্জনিত প্লাবন। একই সময়ে, বিশেষত উত্তর ভারতে অত্যধিক তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যথা গ্রীষ্মে ক্রমবর্ধমান এবং শীতে ক্রমহ্রাসমান তাপমাত্রা এবং মরুপ্রবাহের বর্ধিষ্ণুতা। একই সঙ্গে আমরা দেখতে পেয়েছি রুশ ও আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বনে-জঙ্গলে দাবানল বা অত্যধিক তুষারপাত। গত ১০-১৫ বছরে সমগ্র ইউরোপে যে বর্ষা-বন্যা-প্লাবন ঘটেছে তাকে ঐতিহাসিক বললে ভুল হবে না। গত একমাসেই ইংল্যান্ডের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বরফপাতের বদলে বন্যায় জলমগ্ন বহু জনপদ। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আর কোনো সন্দেহ নেই যে জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব-উষ্ণায়ণের কারণ--- বর্তমান ও সাম্প্রতিক মানব 'সভ্যতা'ই দায়ী। এখন জনসাধারণ অনুধাবন করতে পারছে যে আমাদের 'কার্বন'-জনিত শিল্পায়ন ও বন-জঙ্গল-উদ্ভিদ বিনাশের ফলে আমরা নিজেদের প্রাকৃতিক বিনাশ ডেকে আনছি। একদিকে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জাত দাহ্য পদার্থের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ও অপব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলের নির্গত উত্তাপ ও কার্বন-ডাই- অক্সাইডের মাত্রা বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে বন-জঙ্গল কেটে জনসম্পদ বা ক্ষেতখামার তৈরির বৃদ্ধির ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের শুদ্ধিকরণ (যা থেকে আমরা প্রাণধারণের অক্সিজেন পেয়ে থাকি) ক্রমশ কমে আসছে--- যথা, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এই গ্যাসের পরিমাণ হাওয়ায় ০.০৩ শতাংশ ছিল যা মাত্র ১৫-৩০ বছরের মধ্যে ০.০৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যা অভাবনীয় (তার কারণ কার্বন- ডাই-অক্সাইড পৃথিবীর উত্তাপ ধরে রেখে মহাশূন্যে বিকিরণ হতে রোধ করে— যে কারণে একে 'গ্রিন হাউস গ্যাস' আখ্যা দেওয়া হয়)।

সম্প্রতি প্যারিসে জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেল, তা প্রধানত এই সমস্যাটিকে ঘিরে— এই গ্যাসের মাত্রা আর মাত্র ০.০৪৫ শতাংশতে পৌঁছলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ২° সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাবে এবং বিশ্ব-উষ্ণায়ণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে যাবে। ফলে মানব সভ্যতার অমোঘ নিয়তি ঘনিয়ে আসবে শুধু নয়, প্রাণী জগতের জৈব সভ্যতার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। গত ১৫০ বছরের রেকর্ডে ২০১৫ সাল আন্তর্জাতিকভাবে সর্বোচ্চ উষ্ণায়ণের বছর বলে গণ্য করা হয়েছে এবং প্রতি বছর ১২০০—২০০০ প্রজাতির বন্য ও জলজ প্রাণীর অবলুপ্তির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ণের জন্য প্রধানত তিনটি পদ্ধতির প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো, অ্যান্টার্টিক মহাদেশের হিমবাহের বর্ধমান গলন— বাৎসরিক হার ৩০ হাজার কোটি টনেরও বেশি, যার ফলে সমুদ্রের উচ্চতাও বেড়ে চলেছে। এই ভাবে তুষার প্রান্ত ও পর্বতমালার যত ক্ষয় হবে, ততই এই শ্বেতশুভ্র মণ্ডল হতে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির মাত্রা কমতে থাকবে এবং ঘনকৃষ্ণকায় সামুদ্রিক জলস্তর আয়তনে বাড়তে থাকবে যা অধিকমাত্রায় সূর্যতাপ শোষণ করতে সহায়তা করে। প্রসঙ্গত, বৈজ্ঞানিকরা আশঙ্কা করছেন যে শতাব্দীর শেষে সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা ১ মিটার পর্যন্ত উঠে এক আন্তর্জাতিক প্রলয়ের সূচনা করবে, যার ফলে ১৪৭টি শহর ও জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে (যেখানে কলকাতা শহরের স্থান সপ্তম)।

দ্বিতীয়ত, সাইবেরিয়া ও উত্তর আমেরিকা-কানাডা-আলাস্কা সমূহ বিস্তীর্ণ তুষার-ধবল উপত্যকার বরফ গলতে শুরু করায়, প্রাগৈতিহাসিক কালের তুষার কবলিত জীবাশ্ম ক্রমশ বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে পচন আরম্ভ করে দিয়েছে। যার ফলে প্রভুত পরিমাণ মিথেন গ্যাস নির্গত হতে আরম্ভ হয়েছে। মিথেন গ্যাস কার্বন-ডাই- অক্সাইডের অপেক্ষা বহুগুণ উত্তাপ-বিকিরণ নিরোধক এবং সেইজন্য 'গ্রিন হাউস গ্যাস' হিসাবে অধিকতর ক্ষতিকর।

তৃতীয়ত, যতই উষ্ণায়ণ বৃদ্ধি পাবে, ততই বন-জঙ্গল দাবানলের অগ্নিবাহর প্রতাপ বাড়তে থাকবে, যার ফলে নির্গত কার্বন-ডাই- অক্সাইডের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। উষ্ণায়ণ আরো বাড়বে— আরো বেশি দাবানলের সৃষ্টি হবে। যে চক্রের কোনো শেষ নেই। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, শতাব্দীর শেষে ৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। প্যারিসে বিশ্ব-পরিবেশ সম্মেলনের বহু আগেই বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছেন যে, একধারে যেমন সমুদ্র জল আয়তন বৃদ্ধির ফলে বহু কোটি মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হবেন, অন্যধারে উষ্ণায়ণের ফলে ও অত্যধিক ভূগর্ভস্থ জলের উত্তোলনের ফলে বিশাল জলসঙ্কট দেখা দেবে। ১৯৪৭ সালে ভারতের মাথাপিছু জলের পরিমাণ ছিল ৬০৪২ ঘনমিটার, তা ২০১১-তে নেমে এসেছে ১৬৪৫ ঘনমিটার এবং ২০৫০ সালের মধ্যে আনুমানিক ১১৪০ ঘনমিটারে এসে দাঁড়াবে। তার সঙ্গে হিমালয় প্রান্তরের ২০০টি হিমবাহের দ্রুত গলন এবং যে কোনো সময়ে অপ্রত্যাশিত প্লাবন-বিপর্যয়ের ফলে হঠাৎ বন্যা ও তারপর খরা দেখা দেবে, যা বর্তমানকালেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধু উষ্ণায়ণ নয়, গাঙ্গেয় উপত্যাকার নদীগুলিতে ক্রমান্বয় বাঁধ নির্মাণ করলে আমরা অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হবো কিনা তাও বিচার্য। যেমন বিচার্য বিভিন্ন নদ-নদীকে জুড়ে দেবার প্রকল্প।

শেষে আসা যাক বঙ্গভূমির কথায়। গত কয়েক দশকে যেমন ৬৪ শতাংশ ভূগর্ভস্থ জলস্তরের হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে, তেমনিই সংস্কার বিহীনতার ফলে প্রধান নদীগুলির নাব্যতা (পলি পড়ে) ১০-১৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। যার ফলে উষ্ণায়ণের প্রভাব যোগ করলে প্রতি বছর বন্যার প্রকোপ বাড়তে বাধ্য। বিট্টু সায়গলের মতো পরিবেশবিদরা মনে করেন, ২০৩০-৩৫ সালের মধ্যে সুন্দরবন এলাকার অস্তিত্বের আশঙ্কা আছে এবং যার ফলে ১-১.২ কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতা তথা দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করবে। কিন্তু কলকাতার তাপমাত্রা ততদিনে ৪৮° সেন্টিগ্রেড ছড়িয়ে যাবে। বায়ুদূষণ ইতিমধ্যে দিল্লীকে ছাড়িয়ে গেছে। এরপরও কি আমাদের প্রশাসনের ঘুম ভাঙবে? আমরা ও আমাদের উত্তরসূরিরা যাবো কোথায়?

উষ্ণায়ন ও দূষণের ভয়াবহ চিত্রপটটি তুলে করা হলো, যাঁরা এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে অবগত হতে চান তাঁরা স্বনামধন্য প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ড. এ পি জে আবদুল কালামের 'Year 2070'র বর্ণনা খুলে দেখতে পারেন। সেখানে দূষণের কবলে মানব সভ্যতার অগ্রগতির স্থানে ভয়ঙ্কর পশ্চাৎগতি দেখানো হয়েছে। পরিবেশ দূষণ ও বিশ্ব উষ্ণায়ণ পরস্পরের পরিপূরক। দূষণ থেকে উষ্ণায়ণ এবং উষ্ণায়ণ থেকে ক্রমবর্ধমান দূষণের ফল পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে লক্ষণীয়। যথা দিল্লী, বেজিং এবং অন্যান্য শহর। প্রসঙ্গত, কলকাতা শহরের দূষণ যে ক্রমাগত দিল্লীর দূষণকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে আমরা উদাসীন কেন তাও বিচার্য।

শুধু উষ্ণায়ণ ও পরিবেশ দূষণ আবহাওয়া, জল, বায়ু ও আমাদের জীবনযাত্রাকে বিষিয়ে দিচ্ছে তা নয়, এর ফলে ক্যানসার ও ব্রঙ্কাইটিসের মতো রোগ ভোগের প্রকোপে শহরাঞ্চলের মানুষের জীবন ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

সৌর শক্তি সম্পর্কে সকলেই অল্প বিস্তর অবগত আছেন। কিন্তু এর ইতিহাস অতি আশ্চর্য। সিলিকন থেকে যে সৌর বিদ্যুৎ আজকাল উৎপন্ন হয় তার মৌলিক অবদান অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের। পদার্থবিদ্যায় তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার রশ্মি বিদ্যুৎ (photo-voltaic Effect)। যার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সিলিকন থেকে উৎপাদিত আলোকবিদ্যুৎ এখন শুধু ঘরে ঘরে গ্রামে শহরে পৌঁছে গেছে তা নয়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের গঠন চলছে পৃথিবী জুড়ে। গ্রীষ্মের সময় জার্মানির মতো উন্নত দেশ প্রায় ২০-২৫ শতাংশ বিদ্যুৎ সিলিকন সৌরজনিত কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন করে। চীন প্রতিমাসে ১ হাজার মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করে চলেছে।

নরওয়ে ও ডেনমার্কের মতো দেশগুলিও তাদের অর্ধেক বিদ্যুতের পরিমাণ সৌরবিদ্যুৎ অথবা বায়ু চালিত বিদ্যুৎ থেকে উৎপন্ন করে। প্রসঙ্গত, জার্মানি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ২০২০-র মধ্যে আণবিক চুল্লি ও ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় সমস্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হবে। অথচ আমরা ঠিক এর উল্টো পথে হাঁটছি। এটাই হলো আমাদের পরম আশ্চর্য, যার জন্য অন্যদের দোষ দেওয়া যায় কি?

অথচ আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা এর সমাধান বহু বছর ধরেই করে এসেছেন। রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে তিন ধরনের সৌর বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সিলিকন আলোক বিদ্যুৎ, প্যারাবোলা আকারের আয়না থেকে প্রতিফলিত উচ্চমানের তাপবিদ্যুৎ এবং রঞ্জনের জন্য উচ্চতাপের জল ও জলীয় বাষ্প। এর প্রযুক্তি বিদ্যা আমাদের সমস্তভাবে আয়ত্তগত কিন্তু বিস্তৃত আকারে পরিগঠন যে হারে হওয়া উচিত সে হারে হয়তো হচ্ছে না। বর্তমান ভারত সরকারের তরফ থেকে এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ নেওয়া হয়েছে। ১৭৫০০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুতের পরিকল্পনা আছে, তা এই মুহূর্তে যথেষ্ট উৎসাহজনক নয়। পশ্চিমবাংলায় বিক্রম সোলার, গ্রিন সাসটেনেবল টেকলজি রিসার্চ লিমিটেড, পশ্চিমবঙ্গ অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি সংস্থা প্রভৃতি সৌরশক্তিতে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু রাজস্থান গুজরাট ও অন্ধ্রের সমকক্ষ হতে দেরি আছে। অথচ এই প্রযুক্তিগুলির সিংহভাগই ২০-২২ শতাব্দীর বেশি পুরোনো। আর্কিমিডিস প্যারাবোলা আকৃতির আয়নায় প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি দিয়ে ২২০০ বছর আগে রোমান সৌন্যবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ বারেবারে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন বলে খ্যাত আছে। এ বিষয়ে ভারত সরকারের Jawaharlal Nehru National Solar Mission কিছুটা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল বটে কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়িত করতে ততটা সক্ষম হয়নি যতটা বেসরকারি বৈদ্যুতিক সংস্থাগুলি সক্ষম হয়েছে।

সম্প্রতি সৌরবিদ্যুৎ চালিত এরোপ্লেন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে বলে অনেকে অবগত আছেন এবং লন্ডনের শহরে একটি বড় ব্রিজের উপরে সৌর রশ্মি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তবে সৌর বিদ্যুতের কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। যেমন সূর্যের প্রদক্ষিণের জন্যে Solar pholo voltaic cell অথবা parabolic reflector— এগুলিকেও সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রদক্ষিণ করতে হয়। সেই প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের হাতে আছে। দ্বিতীয় সমস্যা হলো, রাত্রে বা ঝড়-বৃষ্টির সময় ব্যাটারির মাধ্যমে এই বিদ্যুৎকে ধরে রাখতে হয়। যার ফলে এর খরচ বেড়ে চলে। তা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞদের মতে দু' এক বছরের মধ্যে সৌরবিদ্যুতের দাম ক্রমাগত নিম্নমুখী হবে। এবং কয়লাজনিত তাপবিদ্যুতের দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় পরস্পরের দামের দিক থেকে এক বাণিজ্যিক সামঞ্জস্য আসতে বাধ্য। যেখানে ভারতে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের দাম ৩ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ৪ টাকা ৫০ পয়সা প্রতি ইউনিট, সেখানে তাপ বিদ্যুতের দাম ইতিমধ্যেই ৪ টাকা ৬৩ পয়সায় নেমে এসেছে (অন্ধ্রপ্রদেশের ২০০০ মেগাওয়াট ইউনিটের টেন্ডারে, আমেরিকার সংস্থার হিসাব মতো)। সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে ১ হাজার ওয়াট (বা ঘণ্টায় এক ইউনিট) সূর্যরশ্মির তেজ পেয়ে থাকি। বর্তমানে রশ্মিবিদ্যুৎ বা phalo voltaic cell থেকে উৎপন্ন সৌরশক্তি মাত্র ২৫-২০ শতাংশ, তা সত্ত্বেও সৌরশক্তির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তার কারণে গ্রাফিন বলে কার্বনজনিত একটি সৌরশক্তির প্রবর্তকের ভূমিকা ক্রমশ উঠে আসছে। যেমন, প্যারাবোলিক আয়নার শেফলার প্রযুক্তি।

শুধু উষ্ণায়ণ ও পরিবেশ দূষণ আবহাওয়া, জল, বায়ু ও আমাদের জীবনযাত্রাকে বিষিয়ে দিচ্ছে তা নয়, এর ফলে ক্যানসার ও ব্রঙ্কাইটিসের মতো রোগ ভোগের প্রকোপে শহরাঞ্চলের মানুষের জীবন ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে, বিকল্পশক্তির আরও দুটি অঙ্গ না বলে শেষ করা যাচ্ছে না। একটি হলো বায়ু চালিত windmill যা অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, গুজরাট উপকূল প্রভৃতি স্থানেই প্রধানত কেন্দ্রীভূত।

দ্বিতীয়টি হলো বর্জ্যপদার্থ থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন যা স্ক্যানডিনেভিয়ার দেশগুলিতে বিশেষ করে প্রচলিত। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ সংরক্ষণের জন্য আরও উচ্চমানের কার্বনজনিত বা জৈবজনিত ব্যাটারি এবং Super Capacitor-এর উদ্ভাবনার ফলে অপ্রচলিত বিদ্যুৎ শক্তির সংরক্ষণ আরও দ্রুতভাবে এমনই প্রচলিত হয়ে উঠবে। এর আর একটি ফল— শুধু বায়ু দূষণ বা বিশ্ব উষ্ণায়ণ থেকে মুক্তি নয়; বৈদ্যুতিক গাড়িরও প্রচলন। ∎

রাজ্যে রাজ্যে

আসন্ন বসন্তে অসমে ফুটতে পারে পদ্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এ বছরের বসন্তে অসমে পদ্মফুল ফোটার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মহল গোটা তিনেক ফ্যাক্টরের কথা বলছে। প্রথমত, অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর। ইতিপূর্বে টানা তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সাফল্যের সঙ্গে জয়ী হয়েছিল তরুণ গগৈ-এর কংগ্রেস। সুতরাং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি-কে কাজে লাগানোর দারুণ সুযোগ বিজেপি-র সামনে। দ্বিতীয় ফ্যাক্টর হলো কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব-কল্যাণ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল। বর্তমানে তিনি রাজ্য বিজেপি-র নতুন সভাপতিও বটে। ইতিপূর্বে অসম গণপরিষদে ছিলেন। তাই তাঁর ভোটযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবার বিজেপির অনুকূলে ভালোভাবেই কাজ করবে বলে রাজনৈতিক মহলের আশা। তৃতীয়ত, প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা যে অসমের এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বড়োসড়ো ফ্যাক্টর হতে চলেছেন, এ বিষয়ে সব পক্ষই মোটামুটি একমত। হিমন্ত ছিলেন যাকে বলে একেবারে তরুণ গগৈ-এর ডান হাত। কিন্তু গগৈ-পুত্র গৌরবের উত্থান তাঁকে বিপদে ফেলল। তরুণ গগৈ ঘোষণা করলেন, গৌরবের মধ্যে নেতা হওয়ার যাবতীয় মশলা রয়েছে। শুধুমাত্র 'উত্তরাধিকা'-এর অজুহাতে তা থেকে গৌরবকে ঠেকানো যাবে না। স্পষ্টত, কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রের সাবেকিয়ানায় এ এক নয়া সংযোজন। যদিও গগৈ-এর ভাবের ঘরে চুরি ধরতে অসুবিধে হয়নি বিশ্বশর্মার। তাই সটান কংগ্রেসের হাত ছেড়ে বিজেপি-র হাত ধরলেন তিনি।

মোটামুটি এই তিনটি ফ্যাক্টরকে এবারে অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে তুরূপের তাস বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু অসমের সামাজিক বাস্তবতাটাও এখন লক্ষ্য করার মতো। ২০১১-র জনগণনা রিপোর্ট বলছে রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৩৪.২ শতাংশই মুসলমান। এমনিতে ভারতে যখন যেখানে যে যেমন সুযোগ পাচ্ছে, বিজেপি-র বিরুদ্ধে মুসলমান জুজু দেখিয়ে প্রয়োজন- মতো সাম্প্রদায়িক তাস খেলছে। সুতরাং অসমে বিপুল মুসলমান জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে এখানেও বিজেপি-বিরোধীদের সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর সম্ভাবনা প্রবল। তবে অসমের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের এই অপকৌশল মুখ থুবড়ে পড়বে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। মুসলমান অনুপ্রবেশের সমস্যায় পুড়ছে গোটা রাজ্য। এই বিপুল সংখ্যক মুসলমানের একটা বড়ো অংশই অনুপ্রবেশকারী। কিছুদিন আগেই বোরোদের সঙ্গে এদের খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। একথা সবাই জানেন, অসমের এই জ্বলন্ত সমস্যার মূলে রয়েছে তরুণ গগৈ সরকার। 'অনুপ্রবেশ' বলে যে কোনো বস্তু পৃথিবীতে থাকতে পারে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তরুণ গগৈ একটা সময় স্পষ্টতই সেটা অস্বীকার করেছিলেন। ইদানীং দায়ে পড়ে অনুপ্রবেশের কথা স্বীকার করে নিলেও অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে তাঁর সরকার এখনও দ্বিধাগ্রস্ত।

এই অনুপ্রবেশ সমস্যাই এবার অসমের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সবচেয়ে বড়ো মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন। কারণ প্রথমত, জাতি-ধর্ম- বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে অসমবাসী আর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সহ্য করতে পারছেন না। অথচ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা মূলত কংগ্রেসের মদতেই অসমে নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস ছাড়াও অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে যাদের ভোটবাক্স ফুলে-ফেঁপে উঠছে তারা হলো বদরুদ্দিন আজমলের অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড

অসম বিধানসভা নির্বাচন : ২০১১

প্রধান দল	প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে	জয়ী	সুইং (আসন)	ভোট শতাংশ
বিজেপি	১২০	৫	–৫	১১.৪৭
কংগ্রেস	১২৬	৭৮	+২২	৩৯.৩৯
বিওপিএফ	২৯	১২	+১	৬.১৩
অসম গণপরিষদ	১০৪	১০	–১৪	১৬.২৯
এ আই ইউ ডি এফ	৭৭	১৮	–৯	১২।৫৭

লোকসভা নির্বাচন : ২০১৪

প্রধান দল	প্রাপ্ত আসন	ভোট শতাংশ
বিজেপি	৭	৩৫.৮৬
কংগ্রেস	৩	২৯.৯০
বিওপিএফ	০	২.২১
অসম গণপরিষদ	০	৩.৮৭
এ আই ইউ ডি এফ	৩	১৪.৯৮

ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট বা এ আই ইউ ডি এফ। মৌলবাদী মুসলমানদের একটা বড়ো অংশের সমর্থনও এদের পেছনে রয়েছে। ২০০৬ সাল থেকে এই দলের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লক্ষণীয়। সে বছর বিধানসভা নির্বাচনে এ আই ইউ ডি এফ ১০টি আসন পেয়েছিল। ২০১১ সালে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে পায় ১৮টি আসন। গত লোকসভা নির্বাচনে ৩টি আসন জেতে। এই দলের উত্থান সাধারণ অসমবাসী কোনোদিনই ভালোভাবে নেননি। সুতরাং আজমলের বিজেপি-বিরোধী 'মহাগটবন্ধন ফর্মুলা' এই বিধানসভা নির্বাচনে অসমবাসী-কে একপ্রকার মেরুকরণের দিকে ঠেলে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যে মেরুর একদিকে থাকছে বিজেপি ও তার সহযোগীরা, অন্যদিকে এর বিরোধীরা। সেক্ষেত্রে বিপুল সাফল্যের সঙ্গে একক কৃতিত্বে অসমে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখতেই পারে বিজেপি।

গত লোকসভা নির্বাচনে অসমের অর্ধেক আসনে জিতেছিল তারা। মোদী নীতি নিয়েছিলেন যে বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে উচ্ছেদ হওয়া হিন্দুরা এদেশের শরণার্থী, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে অসমবাসীর সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ জাগরণে এই নীতি যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশি মুসলমানরা যেভাবে অসমের প্রকৃত অধিবাসীদের রুটি-রুজিতে ভাগ বসাচ্ছিল তাতে এখানকার মুসলমানরা অনুপ্রবেশকারীদের ওপর মহাখাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। তার সুফলও এবার বিজেপির ঘরে যেতে পারে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

হিমন্ত বিশ্বশর্মা

সর্বানন্দ সোনওয়াল

নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তাও এক্ষেত্রে বিজেপির বড়ো ভরসা। গত লোকসভা নির্বাচনের পর তিনি যেভাবে ঐতিহাসিক জমি-চুক্তি- সহ অসমের উন্নয়নে ২ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ এবং ঢাকা-উত্তর পূর্ব ভারতের শহরগুলির মধ্যে বাসযাত্রার সূচনা করেছেন তাতে অসমের অধিবাসীদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়ছে। সুতরাং নানা তিরে বিদ্ধ কংগ্রেস অসমে কতটা লড়াই দিতে পারে সেটাই এখন দেখার। ■

মহাকুম্ভ মেলা উজ্জয়িনী—২০১৬

ভগবান শিবশঙ্করের অশেষ দয়ায় কাশীর শিবশক্তি সেবাধাম আশ্রমের উদ্যোগে উজ্জয়িনীতে আগামী ১২ এপ্রিল থেকে ২০ মে মহাকুম্ভে মেলায় পুণ্যার্থীদের শিবিরের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আগ্রহী ভক্তগণের নিকট প্রার্থনা তাঁরা যেন আগে থেকেই শিবিরে অংশগ্রহণ করার জন্য বুকিং করে রাখেন। যোগাযোগ ও অনুদান রাশি প্রেরণের জন্য :

মোবাইল নং ০৯৪৫১২৬৮৬০০/০৮৭৬৫৫৪৮৯৩৮

State Bank-এর শাখায় IFSC/SBI No. 001190

ভোটারকার্ড বা আধার কার্ডের ফোটোকপি মোবাইল নং-সহ ২ কপি ফোটো সঙ্গে আনতে হবে।

শিবির স্থান :

সন্ত মীরা কনভেন্ট স্কুল
ব্যায়ামশালার গলি, ভাগসীপুরা
জহরমার্গ, গুদরী, উজ্জয়িনী

ভবদীয়—
হৃষীকেশ ব্রহ্মচারী
শিবশক্তি সেবাধাম, কাশী

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

প্রেরণার পাথেয়

‘অহিংসা পরমো ধর্ম’— এই ধারণা হিন্দুদের রক্তেই রহিয়াছে। এই শিক্ষা অপরকে দেওয়ার দায়িত্ব তাই আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। হিন্দু সমাজ দুর্বল, তাই দুর্বলের অহিংসা প্রচার অর্থহীন। যাহাদের মধ্যে হিংসার প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহারা কখনও দুর্বলের উপদেশ শুনিবে না। তাই অহিংসার প্রচার করার পূর্বে আমাদের উপদেশকে ফলপ্রসু করার জন্য শক্তিশালী হইতে হইবে। আমাদের নিজেদের দেশের মধ্যে অহিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য হিন্দু সমাজের দুর্বলতা দুর করিয়া তাহাকে শক্তিশালী হইতে হইবে। সংগঠনের মধ্যেই রহিয়াছে শক্তি। তাই হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করা প্রত্যেক হিন্দুর প্রথম কর্তব্য। সঙ্ঘ সেই কাজই করিতেছে। হিন্দুরা ধর্মপ্রাণ বা ধর্মনিষ্ঠ। তাহার জন্য আমরা গর্ব বোধ করি। কিন্তু ধর্ম পালন ও ধর্ম রক্ষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজা, পাঠ ইত্যাদি ব্যক্তিগত কর্ম করার অর্থ ধর্ম রক্ষা নয়। যাঁহারা ধর্মকে রক্ষা করিতে চান তাঁহাদের মধ্যে ধর্মের উপর সব রকম আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো শক্তি থাকা চাই। তবে আমরা ধর্মনিষ্ঠ হইব।

(সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের বাণী থেকে)

‘ জাতীয় শিক্ষা কি রূপ নেবে বলা সম্ভব ছিল না। তবে সে শিক্ষা যে রকমই হোক না কেন, এটা নিশ্চিতভাবে অনুভূত হয়েছিল যে এই শিক্ষা আন্দোলন গভীর জাতীয়তাবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত জনগণের সহায়তায় নারীজাতি কর্তৃক পরিচালিত হবে।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সমাবেশ সমাচার

সংস্কৃতভারতী আয়োজিত পত্রাচারদ্বারা সংস্কৃত পরীক্ষা

গত ৩ জানুয়ারি সকাল ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত ৩২টি কেন্দ্রে প্রাথমিক সংস্কৃত শিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণ করে সংস্কৃতভারতী দক্ষিণবঙ্গ শাখা। ১৫ থেকে ৮৩ বছর বয়সের পুরুষ ও মহিলা শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে সংস্কৃত পিপাসু শিক্ষার্থীগণ লিখিত পরীক্ষা দেন। কলকাতায় ৪টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়। তার মধ্যে অন্যতম কেন্দ্র ছিল গিরীশ পার্কের কাছে রঘুমল আর্য বিদ্যালয়। যেখানে পরীক্ষার্থী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুজিত সিংহ ও ৭৭ বর্ষীয় বিজ্ঞানী অমর

মজুমদার। তাঁদের কথায় সংস্কৃত ভারতের মুখ্য ভাষা। তাঁদের মতো ব্যক্তিদের এই ভাষা জানতে বা শিখতে হলে বাংলায় কোনো ব্যবস্থা নেই। সংস্কৃতভারতীর এই প্রয়াসে তাঁরা আনন্দিত ও উপকৃত। এখানে যে কোনো বয়সের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারেন। সংস্কৃতভারতীর দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ জানান, সংস্কৃত ভারতের আত্মা। সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভারতের সংস্কৃতির জাগরণ সম্ভব। সংস্কৃতভাষার প্রচার ও প্রসারে সংস্কৃতভারতী গত আট বছর এই বাংলায় কাজ করে চলেছে। প্রতিদিন দুই ঘণ্টার দশ দিনের সম্ভাষণ শিবিরের মাধ্যমে প্রায় পঁচিশ হাজারেরও বেশি বাঙালি সংস্কৃতে কথা বলার যোগ্যতা লাভ করেছেন।

কিন্তু যাঁদের হাতে সময় কম তাঁদের জন্য বাড়িতে বসেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত পড়ার সরল ও উত্তম ব্যবস্থা— 'পত্রাচার দ্বারা সংস্কৃতম্' শিক্ষা। চারটি পাঠ্যক্রম— প্রবেশঃ, পরিচয়ঃ, শিক্ষা ও কোবিদ। প্রত্যেক পাঠ্যক্রম ছয় মাসের। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের প্রমাণপত্র দেওয়া হবে। বাংলায় এই ধরনের পরীক্ষা প্রথম। প্রথম পাঠ্যক্রম প্রবেশঃ পরীক্ষা এবছর শুরু হলো। অত্যন্ত আনন্দের খবর, শুরুতেই দক্ষিণবঙ্গের বত্রিশটি কেন্দ্রে প্রায় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন। এই বাংলা একদা সংস্কৃতের পীঠস্থান ছিল। সেই হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃত বাতাবরণ পুনরায় ফিরে আসছে। বিপুল সংখ্যায় সংস্কৃতপ্রেমীদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহই এর প্রমাণ।

চাঁচলে সামাজিক সদ্ভাবনা বৈঠক

গত ১ জানুয়ারি শুক্রবার চাঁচল বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় উত্তর মালদা জেলার 'সামাজিক সদ্ভাবনা বৈঠক। প্রদীপ জ্বালিয়ে এই সভার উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক গোপালজী রাম (গায়ত্রী পরিবার), শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু আশ্রমের ছায়া বসাক, উত্তর মালদা জেলাকার্যবাহ দেবব্রত দাস, প্রান্ত কার্যকারিণী সমিতির সদস্য চন্দন সেনগুপ্ত প্রমুখ। উত্তর মালদা জেলার বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর প্রমুখ ও ধর্মীয় সংগঠনের পক্ষে ২৫ জন প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। সামাজিক সদ্ভাবনা বিষয়ে উপস্থিত সকলে নিজেদের মতামত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। জেলার সাঁওতাল সমাজের মুখিয়া নাইকি হাঁসদা তাঁদের সমাজের কু-প্রথাগুলো তুলে ধরেন। জাত-পাত, উচ্চ-নীচের বিভেদ ভুলে চললেই সমাজের উন্নতি এবং পরপীড়ন পাপ প্রভৃতি উল্লেখ করে

হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের সেকাল- একাল সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার। 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন পৃথা দাস। প্রদীপ প্রজ্বলন মন্ত্রোচ্চারণ করেন আচার্যা চন্দনা চ্যাটার্জী। চন্দনের ফোঁটা দিয়ে অতিথিবরণ করেন আচার্যা মুক্তি বসাক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন চাঁচল নগর কার্যবাহ দীপক চ্যাটার্জী।

সংস্কার ভারতীর আঞ্চলিক শিল্পী সম্মেলন

গত ৩ জানুয়ারি সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উত্তর কলকাতা, বাগুইআটী, গোবরডাঙ্গা শাখা ও বনগাঁ সম্পর্কস্থানের শিল্পী সমন্বয়ে আঞ্চলিক শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ২৪ পরগনার হৃদয়পুর প্রণব কন্যা সঙ্ঘে। আশ্রমের সহঅধ্যক্ষা পূজ্যা সন্ন্যাসিনী জ্ঞানানন্দ মাতা ভারতমাতা ও প্রণবানন্দজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে সম্মেলনের

সূচনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন প্রদেশ সহ-সঙ্গীত প্রমুখ সবিতা দত্ত। মাতাজী তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের শাশ্বত ও সনাতন সংস্কৃতিকে নবপ্রজন্মের মধ্যে প্রচার ও প্রসারে এই বাংলায় ১৯৮৭ সাল থেকে সংস্কার ভারতী ব্রতী হয়েছে। আমরা হিন্দু, আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে। প্রদেশ কার্যকরী উপদেষ্টা সুভাষ ভট্টাচার্য বলেন, আগামী বছর সংস্কার ভারতীর ৩০ বছর পদার্পণ উপলক্ষে ২৫ তম প্রাদেশিক শিল্পী সম্মেলন সম্মিলিত ভাবে উদ্‌যাপন করা হবে। 'সংস্কার ভারতীতে আমাদের প্রাপ্তি'— এই বিষয়ে আলোকপাত করেন শাখা সম্পাদক অমিত দে, সুজাতা ভট্টাচার্য ও শাশ্বতী নাথ। বনগাঁ থেকে সুপ্রীতি সুতার সঙ্গীত পরিবেশ করেন। উত্তর কলকাতা পরিবেশন করে গীতি-আলেখ্য 'স্মরণে বরণে পঞ্চগীতিকবি ও স্বামীজী'। অংশগ্রহণ করেন মালবিকা সাহা, মিতালী ভট্টাচার্য, অঞ্জু চ্যাটার্জী, জয়ন্তী মিত্র, মন্দিরা দে, রূপা দে, মাস্টার ঋষভ ও পরিচালনায় অমিত দে। স্বরচিত ভাষ্য পাঠ করেন রীণা ব্যানার্জী। বাগুইআটী শাখা পরিবেশন করে 'মাটির টানে প্রাণের কাছে'— বাংলার লোকসঙ্গীত সমন্বিত গীতি-আলেখ্য। অংশগ্রহণ করেন সুজাতা ভট্টাচার্য, অঞ্জনা মল্লিক, শঙ্করী দত্ত, শীলা সাহা, প্রতিমা সাহা, কল্পনা চ্যাটার্জী, ত্রিপর্ণা দাস ও পরিচালনায় সবিতা দত্ত। ভাষ্য পাঠ ও তবলা সঙ্গতে ছিলেন যথাক্রমে সমর অধিকারী ও সন্দীপ রায় চৌধুরী। গোবরডাঙ্গা শাখার শিশু শিল্পীরা মঞ্চস্থ করে নাটিকা 'সত্যি রাজার দেশে'। পরিচালনায় ছিলেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। শিশু শিল্পীদের অভিনয় ছিল অনবদ্য। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। সম্মেলন পরিদর্শন করেন সুকুমার সেন, ভরত কুণ্ডু, শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল ভট্টাচার্য।

ক্রীড়া ভারতীর রাষ্ট্রীয় খেল সঙ্গম

গত ২৫ থেকে ২৭ ডিসেম্বর ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে 'রাষ্ট্রীয় খেল্ সঙ্গম্' অনুষ্ঠিত হয় রাজস্থানের জয়পুর শহরে। দেশের ৫০০ জেলা থেকে ১১০০ জন প্রতিযোগী তাতে অংশগ্রহণ করেন। কবাডি ও খো খো খেলার মতো সম্পূর্ণ দেশীয় খেলাগুলিকেই সেখানে উৎসাহিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ভাগাইয়াজী, জয়পুর প্রান্ত প্রচারক শিব লাহাড়ি, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, ক্রীড়া ভারতীর রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ তথা প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার চেতন চৌহ্বান প্রমুখ। উল্লেখ্য, পশ্চিমবাংলা থেকে ৭৮ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ২৮ জন মহিলা।

বাংলার প্রান্ত প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর প্রাদেশিক সম্পাদক বিভাস মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক মধুময় নাথ।

দুর্গাপুরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

দুর্গাপুর সেবা বিভাগের পরিচালনায় নগর সংলগ্ন পাটশেওড়া গ্রামে গত ২০ ডিসেম্বর সারাদিন ধরে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসক ও মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ড. তীর্থঙ্কর দেবের ব্যবস্থাপনায় কলকাতার চিকিৎসকদের একটি দল উপস্থিত থেকে মোট ১৫৫ জন গ্রামবাসীর চিকিৎসা করেন। শিবিরে প্রয়োজনীয় ওষুধেরও ব্যবস্থা ছিল। রক্ত পরীক্ষাও করা হয়। উল্লেখ্য, পাটশেওড়া গ্রামে ২০০৩ সাল থেকে শিশু সংস্কার কেন্দ্র ও পাটদান কেন্দ্র চলছে বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে। গ্রামের প্রায় ২০০ জন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে ১৫৫ জনেরই চিকিৎসা করা হয়। ডাঃ তীর্থঙ্কর দেব গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য সচেতনতার এবং প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে অনেক সমস্যার কীভাবে সমাধান হতে পারে সে বিষয়ে বলেন। সেবা বিভাগ প্রতি দু'মাস অন্তর এনএমও-র সহযোগিতায় স্বাস্থ্য শিবির করে চলেছে দুর্গাপুরে। স্বাস্থ্যশিবিরে আসানসোল জেলা কার্যবাহ ও প্রান্ত সেবা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যোধপুরে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের রাষ্ট্রীয় অধিবেশন

গত ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর রাজস্থানের যোধপুর শহরে বিদ্যাভারতী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের রাষ্ট্রীয় অধিবেশন। দেশের ২৪টি রাজ্য থেকে ১৩৪১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৪৫১ জন মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ডাঃ সঞ্জয় দেবের নেতৃত্বে ৫টি জেলা থেকে ১৩ জন পুরুষ প্রতিনিধি ও ৪ জন মহিল প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল— 'Made in India' নয়, 'Made by India'। এছাড়া চীনা দ্রব্যের আগ্রাসন, একই শিক্ষানীতি চালু করা, সৌরশক্তি উৎপাদন, পলিথিন বর্জন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে উৎসাহ দেওয়া ও স্মার্ট ভিলেজ নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা হয়।

মঙ্গলনিধি

গত ২০ ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরের স্বয়ংসেবক বিনয় সিদ্ধান্ত (ভল্টু) তাঁর মেয়ে কৌশিকীর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সঙ্ঘের বিভাগ সঙ্ঘচালক চন্দনকান্তি ভুঁইয়ার হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। আত্মীয় বন্ধুদের উপস্থিতিতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়স্বজনদের পরিচয় করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে প্রবীণ স্বয়ংসেবক লহর মজুমদার সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ তিলক রঞ্জন বেরা মঙ্গলনিধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

পরলোকে গৌরীশঙ্কর প্রামাণিক

মালদহ জেলার মালতীপুরের প্রবীণ স্বয়ংসবক গৌরীশঙ্কর প্রামাণিক গত ৪ জানুয়ারি রাত্রে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মালতীপুর খণ্ড কার্যবাহ হিসেবে গ্রামগ্রামান্তরে সঙ্ঘশাখা বিস্তারে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি ১ পুত্র, পুত্রবধূ, ২ কন্যা, জামাতা, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর পুত্র শুভাশিস প্রামাণিক (বাবু) বর্তমানে উত্তর মালদহ জেলার সহ জেলা কার্যবাহ।

***

মুর্শিদাবাদ জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের লালবাগ মহকুমা কার্যবাহ সরোজ কুমার দাসের পিতা অনিল কুমার দাস গত ২৫ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ কন্যা, ১ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

হাওড়া জেলার বাউড়িয়ার স্বয়ংসেবক কৌশিক শাসমলের মাতৃদেবী আবিরা শাসমল গত ২ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ৬ কন্যা, ৪ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, এলাকার স্বয়ংসেবক ও প্রচারক সবাই মায়ের আশীর্বাদধন্য।

***

স্বস্তিকার কর্মী বারুইপুর নিবাসী শুভময় দেবের পিতৃদেব সমীর কুমার দেব গত ১০ জানুয়ারি ৬৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক পুত্রবধূ ও এক নাতি রেখে গেছেন।

অন্য রকম

ইঞ্জিনিয়র থেকে ট্যাক্সিচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মুম্বইয়ের রাস্তাঘাটে অটোরিক্সা এবং ফিয়েট ট্যাক্সির অভাব নেই। বর্তমানে মেরুক্যাব, ওলাক্যাব পরিষেবা চালু হওয়ায় রোজকার জীবনে চলার পথে সেরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। ট্যাক্সি যে সবসময় যাত্রীর প্রস্তাব মেনে নেয় তাও নয়। পরিষেবা বাড়লেও প্রত্যাখ্যান কিন্তু কমেনি। সে অফিস ফেরত যাত্রী হোক বা মুমূর্ষু রোগী। তবে মুম্বই শহরে রয়েছে এমন একটি ট্যাক্সি যে কখনও যাত্রী প্রত্যাখ্যান করেনি। বিশেষ করে কোনো রোগীর ক্ষেত্রে তো নয়ই। ইঞ্জিনিয়র বিজয় ঠাকুরের ট্যাক্সি দিনে-দুপুরে-রাত্রে সদাসর্বদা সজাগ বিনা ভাড়ায় হাসপাতালে পৌঁছে দেবার জন্য।

লারসেন এবং টুব্রো কোম্পানির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়র ছিলেন বিজয় ঠাকুর। আজ থেকে ৩১ বছর আগে চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নেন তিনি। কারণ হিসাবে জানা যায়, গর্ভবতী ছিলেন বিজয় ঠাকুরের স্ত্রী সরোজ ঠাকুর। রাত ২টো নাগাদ আচমকা তাঁর গর্ভপাত হয়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো ট্যাক্সিই রাজি হচ্ছিল না। অবশেষে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটি অটোরিক্সায় হাসপাতালে যান তিনি। কোনোমতে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয় তাঁর স্ত্রীকে। তিনি তখনই সিদ্ধান্ত নেন চাকরি ছেড়ে ট্যাক্সি চালাবেন। যাতে আর কোনো রোগীকে হাসপাতালে যেতে অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয়। ১৯৮২ সালে চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেন বিজয় ঠাকুর। এরপর ৬৬ হাজার টাকা দিয়ে একটি ফিয়েট ট্যাক্সি কেনেন। তখন থেকেই তিনি ট্যাক্সি চালিয়ে আসছেন।

বহু বছর ধরে ট্যাক্সি চালাচ্ছেন বিজয় ঠাকুর। এখন তাঁর বয়স ৭২ বছর। রোগী নিয়ে হাসপাতাল যাওয়ার জন্য দিনে-রাতে যখনই তাঁকে ফোন করা হোক, হাসিমুখে গাড়ি নিয়ে হাজির হন। কোনো রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে তিনি ভাড়া নেন না। তিনি যদি জানতে পারেন তাঁর গাড়িতে সওয়ারি কোনো ডাক্তার বা রোগী হাসপাতালে যাচ্ছেন তাহলে ভাড়াই নেন না। এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে বিজয় ঠাকুর বলেন, ‘‘আমি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে সারাদিনে যত রোগীকে এই গাড়িতে নিয়ে যাবো তাদের কারোর কাছ থেকে ভাড়া নেব না। রোগীকে বিনা পয়সায় হাসপাতাল পৌঁছে দেওয়াই আমার কাজ।’’ লারসেন এবং টুব্রো কোম্পানির এই মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়র প্রতি মাসে ৬৫ হাজার টাকা বেতন পেতেন। বর্তমানে বিজয়বাবুর আয় ১০ হাজার টাকার নীচে নেমে এসেছে। তবে এতে কোনো আপশোস নেই। তাঁর কথায়, ‘আমি মানুষের সেবা করতে পারছি। রোজগার করাটা আমার উদ্দেশ্য নয়।’’ বর্তমানে বিজয়বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র বিনীত এবং পুত্রবধূ দীপ্তি দু’জনেই দু’টি বেসরকারি সংস্থা ম্যানেজার পদে কর্মরত। তাঁরা একটি সুইফট গাড়ি কিনেছেন। কিন্তু ছোট ছেলের হাজার আবদার সত্ত্বেও তিনি সেই সুইফটে চাপেন না। কারণ তাঁর গাড়িটাই সব। গায়ে বড় বড় অক্ষরে বিজয় ঠাকুরের নাম, ফোন নম্বর লেখা। বিজয় ঠাকুরের ছেলেরা চান না ৭২ বছর বয়সে তাঁদের বাবা ট্যাক্সি চালান। কিন্তু বিজয়বাবু বলেন, ‘‘এই কাজের মধ্যে শান্তি খুঁজে পাই আমি।’’

নিজের ট্যাক্সির পাশে বিজয় ঠাকুর।

দীর্ঘদিনের ট্যাক্সি চালানোর অভিজ্ঞতায় তিনি বহু ঘটনার সাক্ষী। বাঁচিয়েছেন বহু রোগীর জীবন। এরকমই এক ঘটনার কথা জানালেন। গত ৩১ ডিসেম্বর ট্যাক্সি নিয়ে ফিরছিলেন, হঠাৎই তিনি দেখতে পান পথদুর্ঘটনায় আহত হয়ে বেশ কয়েকজন রাস্তায় পড়ে রয়েছে। তিনি গাড়ি থামিয়ে তাদের এক এক করে আর এন কুপার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। সময়মতো তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় একজন মহিলা ছাড়া সবাই বেঁচে যায়। বিজয় ঠাকুরের এই কাজে গর্বিত তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা এবং স্থানীয় মানুষজনও। সব ট্যাক্সি চালকের প্রতি বিজয় ঠাকুরের আর্জি, ‘দয়া করে যাত্রী প্রত্যাখ্যান কেউ করবেন না।’ ■

খেলার মাঠ থেকে সার্কাসের রিংয়ে

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

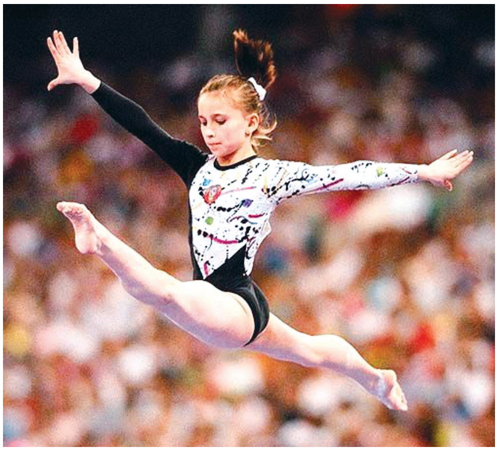

সার্কাস আজ শুধুমাত্র এক বাণিজ্যিক শিল্পক্রীড়াই নয়, বিশ্ব ক্রীড়াসমাজে স্বীকৃত ও সমাদৃত এক সংস্কৃতিও বটে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে বহু অলিম্পিক পদকজয়ী ক্রীড়াবিদ পরবর্তীকালে সার্কাসে এসে বাজিমাত করে দিয়েছেন, দেশে-বিদেশে জনজীবন চিত্তকে আলোড়িত করে দিয়েছেন। যেমন ইতালির অলিম্পিক সোনাজয়ী জিমনাস্ট আলবার্তো ব্রাগলিয়া। ১৯০৮-এর লন্ডন অলিম্পিকে অলরাউন্ড চ্যাম্পিয়ন আলবার্তো সে দেশের সার্কাসে জিমনাস্টিকের খেলা দেখিয়ে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এরকম আরো বহু নিদর্শন আছে। অলিম্পিক পদক সব অর্থেই মহার্ঘ্য, দুনিয়ার সবসেরা স্বীকৃতি। কিন্তু জীবন চালাতে গেলে তো অর্থ দরকার। তাই ঝাঁকে ঝাঁকে জিমনাস্ট সার্কাসে এসে অর্থ উপার্জন করেছেন এবং একই সঙ্গে অগণিত মানুষকে আনন্দও প্রদান করেছেন। এরকমই কয়েকজনকে নিয়ে এই নিবন্ধ।

রোজালিয়া গালিয়েভা, গ্রান্ট গোল্ডিং এলেনা গ্রসচেভা, টেরি বার্টলেট, আর্গেই ভলকভ, ভিক্টর কারিয়কিম এরকম অজস্র নাম। জিমনাস্টদের বাইরে ভারোত্তোলক কুস্তিগির বা অন্যান্য অনেক খেলার বিখ্যাত কয়েকজনকে দেখা গেছে সার্কাসের আঙ্গিনায়। কানাডা, আমেরিকা, ইতালি, চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিখ্যাত অলিম্পিক খেলোয়াড়রা সার্কাসে এসে নানাধরনের খেলা দেখিয়ে জীবনের ক্যানভাসকে রূপ, রং, রসের বৈচিত্র্যে ভরিয়ে তুলেছেন। শুধু বিদেশেই নয় আমাদের দেশেও সার্কাসের টানে গা ভাসিয়েছেন অনেক ক্রীড়াবিদ। বাংলার যুবসমাজের প্রথম যাঁরা শরীরচর্চায় প্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁদের একজন শ্যামাকান্ত ব্যানার্জি। যিনি মল্লবীর শ্যামাকান্ত নামেই পরিচিত। বিখ্যাত মল্লবীর পরেশনাথের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা শ্যামাকান্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর সাত ও আটের দশকে সারা দেশে কুস্তি প্রদর্শন করেছেন এবং বড় বড় মল্লবীরকে হারিয়েছেন। পরে তাঁর মাথায় চিন্তা আসে সার্কাস দল গঠনের। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। অবিভক্ত বাংলার শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জে গিয়ে তিনি কিনে ফেলেন এক চিতাবাঘ। দু' মাসের চেষ্টায় বাঘটিকে বশে এনে সেখানেই বাঘের সঙ্গে খেলা দেখাতে শুরু করেন। ক্রমে বাঘ-সিংহের খেলায় যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ১৮৯৪ সালে তিনি পুরোপুরি সার্কাস দলে ঢুকে পড়েন। হিংস্র জন্তুর সঙ্গে খেলা দেখানোর জন্য ফ্রেডকুকের ইংলিশ সার্কাসে যোগ দেন। মাসিক বেতন ছিল ১৫০০ টাকা। এরপর নিজেই তৈরি করে ফেলেন একটি সার্কাস দল। বাঙালি ব্যায়ামবিদ ও কুস্তিগিরদের মধ্যে চিরস্মরণীয় নাম ভীমভবানী। পোশাকি নাম ভবেন্দ্রনাথ সাহা। সবাই ডাকতেন ভবানী নামে। কেতু গুহের আখড়ায় শরীরচর্চা করে শৈশবে রুগ্ন ছেলেটিই পরে তাগড়াই পালোয়ান হয়ে যান। অল্পদিনেই বাঙালি সমাজে ব্যায়াম ও মল্লবীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান।

শ্যামকান্তির প্রায় সমসাময়িক ভবানীর সার্কাসে আসার কাহিনিটি চমকপ্রদ। মাদ্রাজের বিখ্যাত সার্কাস কোম্পানির মালিক প্রফেসর রামমূর্তি কলকাতায় আসেন খেলা দেখাতে। সামনের সারিতেই বসে ছিলেন ভবানী। তার সুঠাম, সুগঠিত স্বাস্থ্য দেখে রামমূর্তি সটান দর্শকাসন থেকে তাকে তুলে নিয়ে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে যান। তাঁকে সার্কাসে যোগদানের কথা বলায় একবাক্যে রাজি হয়ে যান ভবানী। বাড়িতে কিছু না জানিয়েই তাঁর দলের সঙ্গে মাদ্রাজ চলে যান ভবানী। সেখানে প্রয়োজনীয় অনুশীলন করে একেবারে তৈরি হয়ে দলের সঙ্গে দূরপ্রাচ্য সফরে চলে যান শো করতে। মল্লবীররা সার্কাসে যেসব খেলা দেখাতেন অর্থাৎ বুকে পাথর তোলা, মোটর গাড়ি টেনে ধরে রাখা এসব তো ছিলই, পাশাপাশি শেকলবাঁধা অবস্থায় গোটা শরীরকে নিমেষে মুক্ত করে নিতেন। সার্কাসে বুকে হাতি তোলার মতো দুঃসাহসিক খেলাও দেখিয়েছেন মুর্শিদাবাদের নবাবের অনুরোধে। তাঁর ভীমভবানী নামটি দিয়েছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাভারতের ভীমের সঙ্গে তুলনা করে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মহেন্দ্রনাথের তো ব্যায়ামবীর পরিচয়টাই চাপা পড়ে গিয়েছিল সার্কাসের খ্যাতির কাছে। যৌবনে ব্যায়ামচর্চা করে পেশীবহুল শরীরের অধিকারী হয়েছিলেন। বড় বড় আসরে দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শন করে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন। কিন্তু সার্কাসে শরীরকলা প্রদর্শনের পেশায় যোগ দেন বিখ্যাত এবেল সাহেবের সার্কাস দলে। সেই সার্কাস দল শ্রেষ্ঠ ইস্টার্ন সার্কাস দেশে- বিদেশে প্রচুর শো করেছে। মহেন্দ্রনাথও সব জায়গায় নিজের দেহসুষমা ও পেশীশিল্পের নান্দনিক উপাচার মেলে ধরে নিজেকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। কিংবদন্তী ব্যায়ামবীর আয়রনম্যান হিসেবে খ্যাত নীলমণি দাসও শখের সার্কাসে কয়েকবছর খেলা দেখিয়েছেন। বুকে রোলার তোলার খেলা-সহ আরো নানারকমের দুঃসাহসিক ও অতিমানবিক শক্তিক্রীড়া দেখিয়ে নীলমণি দাশ তাঁর নামের সার্থকতা যথার্থভাবে মেলে ধরেছিলেন। ■

শব্দরূপ-৭৭৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

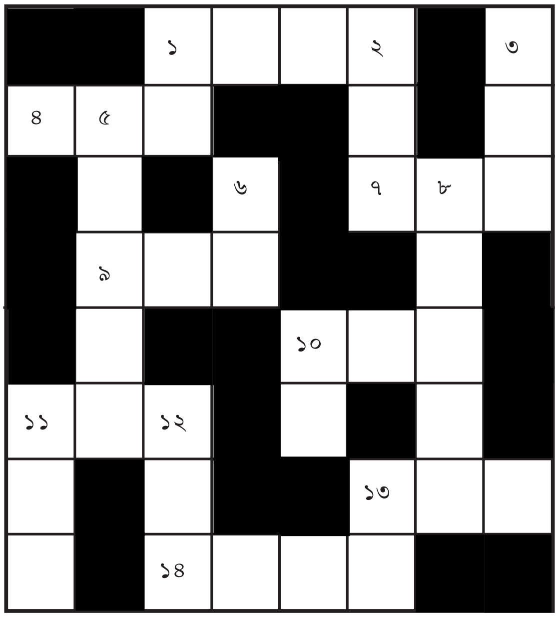

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** মেঘনাদবধ কাব্যে উল্লিখিত রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার বীরপুত্র, **৪.** এই রাজ্যের একটি দর্শনীয় স্থান '— দুয়ারী', **৭.** পলাতক আসামির চেহারার বিবরণ, **৯.** ডাক্তারবাবুদের যা দিতে হয়, ফী, **১০.** উমাপতি, শিব, **১১.** পোষা হস্তিনী যার সাহায্যে খেদায় হাতি ধরা হয়, **১৩.** সিংহদ্বার, ফটক, **১৪.** 'চোরের মায়ের — ' (প্রবাদ)।

উপর-নীচ : **১.** 'বল—, বল উন্নত মম শির', **২.** অবিকল, যথাযথ ('— নকল'), **৩.** কাগজের মোড়ক ('ওষুধের —'), **৫.** উচ্চজাতিতে জন্মের জন্য অভিমান, কুলগর্ব, **৬.** মাড়োয়ারীদের পরব বিশেষ, **৮.** (দর্শনে) সূক্ষ্ম-শরীর, **১০.** শুভকর্মে পুরনারীগণের মুখধ্বনিবিশেষ, **১১.** যে স্ত্রীর ঝগড়া করা স্বভাব, **১২.** কৃষ্ণ, **১৩.** হাটের মালিক বিক্রেতার নিকট হটতে যে পণ্যাংশ বা টাকা নেয়।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৭২

	জো	লা	প		অ	বে	লা
অ	র			মি	ছি	ল	
শী	ত	ল	পা	টি			চো
তি	ল			ল	শ	ক	র
প	ব	মা	ন			রি	পু
র			কু	শ	পু	ত	লি
	ন	ক	ল			ক	শ
মা	ত	লি		সু	ধ	র্মা	

সঠিক উত্তরদাতা
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৭৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বিক্রমাদিত্য।। ১৩

ছিটমহল সমস্যার সমাধান হয়েছে চড়া মূল্যের বিনিময়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় ছিটমহলের উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারি ভাবে মেখলীগঞ্জ, হলদিবাড়ি ও দিনহাটায় তিনটি উদ্বাস্তু শিবির পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বরাদ্দে রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এই শিবিরগুলির বাস্তব পরিস্থিতি চাক্ষুষ করতে গত ২৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহপ্রান্ত প্রচার প্রমুখ সাধন কুমার পাল, প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ গণেশ পাল ও কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির এক প্রতিনিধি দল হাজির হয়েছিলেন মেখলীগঞ্জ উদ্বাস্তু শিবিরে। উদ্বাস্তু শিবিরে সমস্যা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ শিবির কখনোই নিজের বাড়ির মতো হতে পারে না। এখানে অনেক কিছুই মানিয়ে নিতে হয়, শেয়ার করতে হয়। তবে এই শিবিরে এমন অনেক সমস্যার কথাই বাসিন্দাদের অভিযোগে উঠে এল যার মূলে রাজ্য সরকারের দরদ ও সদিচ্ছার অভাবের ছাপ স্পষ্ট। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সৌজন্যে শিবির পরিচালনায় কোনো আর্থিক সমস্যা নেই।

এই শিবির পরিদর্শনের সময় বাসিন্দাদের সিংহভাগেরই অভিযোগ গত দেড় দু'মাস ধরে এখানে একঘেয়ে নিরামিষ খাবার দেওয়া হচ্ছে। সপ্তাহে দুই-তিন দিন আমিষ দিয়ে খাবারে বৈচিত্র না আনলে এই খাবার মুখে তোলা দুষ্কর হয়ে পড়বে। অনেকেই সরকার থেকে দেওয়া নিম্নমানের কম্বল, চাদর, শাড়ি দেখালেন। কোচবিহার জেলার প্রচণ্ড শীতে এই অতি সাধারণ মানের কম্বল বিতরণের জন্য অনেকে যেমন হাসি মস্করা করলেন তেমনি অনেকে ক্ষোভে ফেটেও পড়লেন। এরকম আটটি পরিবার আছে যাদের নাম নথি ভুক্তিকরণের কিছু ত্রুটির জন্য দুটো পরিবারকে একটি ঘরেই থাকতে হচ্ছে। দুই পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি নাতনী নিয়ে একই ঘরে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হচ্ছে এমনটাই জানালেন ষাটোর্ধ্ব ১১৫ বাঁশ কাটা ছিটমহল থেকে আগত কুসুমবালা বর্মন। কাঁদো কাঁদো হয়ে ষাটোর্ধ্ব শশীবালা বর্মন জানালেন তিন পুত্র ললিত বর্মন, বিজয় বর্মন, সুমন বর্মনকে নিয়ে এপারে এলেও কাগজপত্রের জটিলতার জন্য নিয়ে আসতে পারেননি আরেক পুত্র হৃদয় বর্মনকে। একই কারণের জন্য ১১৯ বাঁশ কাটা ছিটমহলের স্বপ্না বর্মন ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসতে পারলেও স্বামী বলরাম বর্মনকে নিয়ে আসতে পারেননি। নিজের স্বামীকে এপারে নিয়ে আসার ব্যাপারে কোচবিহার জেলা শাসকের প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কোনো আশার আলোক নেই স্বপ্না বর্মনের সামনে। কেন এপারে এলেন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে, ওপারেই থেকে গেলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বাংলাদেশের মুসলমান মৌলবাদীদের বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের প্রয়াস এবং তাতে সফল না হলে ধন, মান, সম্পত্তির উপর হুমকি, হিন্দু মা বোনেদের সম্ভ্রমের উপর সদাসর্বদা হুমকিই বাংলাদেশ পরিত্যাগের মূল কারণ বলে জানালেন। যেমন ১১৯ বাঁশ কাটার স্বপ্না বর্মন জানালেন একবার ওঁর পুত্রকে চাষ করে আসার পর হালের বলদ জবাই করে সেই মাংস রান্না করে খেতে দিয়েছিল। সেটা খেতে অস্বীকার করায় ভয়ঙ্কর অত্যাচারের পাশাপাশি ঘর বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার কথাও উল্লেখ করলেন। ভয়মুক্ত স্বাধীনতার পরিবেশে বাঁচার জন্যই এদেশে আসা। সেই পরিবেশ প্রাপ্তির আনন্দের কাছে যে চৌদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে আসার দুঃখ এবং উদ্বাস্তু শিবিরের কষ্ট ও সমস্যাও হার মানছে তা ওদের শরীরের ভাষায় স্পষ্ট। অনেকেই ছিটমহল সমস্যা সমাধান করে দেশের মূল ভূখণ্ডে আসার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুললেন না। শরণার্থীদের সমস্ত কথা দরদ দিয়ে শোনার পর প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত মহলে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উত্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। এখানে উল্লেখ্য, ছিটমহল বিনিময়ের সময় উভয় দেশের ছিটের বাসিন্দাদের সামনে ভারত বা বাংলাদেশ যে কোনো একটি দেশের নাগরিকত্ব বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল। ভারতের মধ্যে বসবাসকারী ১৪৮৬৪ জন বাংলাদেশির একজনও বাংলাদেশে ফিরে যায়নি। সবাই ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে এখানেই থেকে গেছে। বাংলাদেশ থেকে ৯৭৯ জন ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে ফিরে এসেছে। ছিট বিনিময়ের ফলে প্রভাবিত এই সমস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্র ১০০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। যার মধ্যে ৮৯৮.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে ভারতের মধ্যে থাকা বাংলাদেশি ছিট মহলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য। ছিটমহল সমস্যা সমাধান বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বড় সাফল্য সন্দেহ নেই। এই সাফল্য এসেছে চড়া মূল্যের বিনিময়ে। বাংলাদেশের হাতে তুলে দিতে হয়েছে দশ হাজার একর বাড়তি জমি, বহন করতে হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার বাংলাদেশি নাগরিকের বোঝা ও সেই সঙ্গে বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ। ■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
18 January - 2016 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা